লোকপ্রশাসন সাময়িকী
চতুর্দশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৌষ ১৪০৬

'উন্নয়ন' ধারার ২৭ বছরঃ বাংলাদেশের অর্থনীতি, রাষ্ট্র ও সমাজের গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ

আনু মুহাম্মদ*

'Development' in 27 Years: An Anatomical Discourse on Bangladesh Economy, State and Society. Anu Muhammad.

Abstract : This article attempts to evaluate the economy of Bangladesh in a comprehensive way. Keeping twenty-seven years of Bangladesh, after its independence, in perspective, this goes for an anatomical discourse to understand dynamics, constraints and the direction of Bangladesh Economy. Moreover, taking into account the fact that economy does not move automatically, role of the Bangladesh Stare and to other institutions, namely the World Bank and the Non Governmental Organizations (NGOs) are also brought under review. The nature of economic growth/ 'development' has its corresponding impact upon the social fabrics and the people at large. Analysis of the impact has taken place in the last part of the article. From empirical presentation and as well as objective analysis the article reached to the conclusion that, Bangladesh, in the last 27 years, has grown in many ways. Market relations has replaced old non- market economy and pre-capitalist social relations in a significant way. Bangladesh is now more integrated in global economy than anytime before. But, despite its apparent progress and growth in GDP Bangladesh could not change its peripheral status in global economy. Secondly, economic growth could not take course to ensure productive development. On the contrary, it increasingly went towards a socio-economic formation where not the entrepreneurs but the commission agents, bank-defaulters, lumpen multi-millionaires gained dominance. And thirdly, as a result, growth of resources went hand in hand with accumulation, monopolization and wastage of resources as well as increasing inequality.

বর্তমান প্রবন্ধ বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি সামগ্রিক পর্যালোচনার অংশ। পর্যালোচনার সময়কাল ধরা হয়েছে প্রধানতঃ স্বাধীনতা-উত্তর পঁচিশ বছর। তবে কোথাও কোথাও আরও কিছু সময় পর, সাতাশ বছর পর্যন্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রবন্ধে দেশের অর্থনীতি পর্যালোচনাকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে তিনটি ভাগে বিশ্লেষণ উপস্থিত করা হয়েছে। প্রথমতঃ অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি, অর্থাৎ অর্থনীতির সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। দ্বিতীয়তঃ অর্থনীতির পরিচালনাকারী বা অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তারকারী প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিসমূহের পর্যালোচনা। এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (১) রাষ্ট্র ও সরকার (২) বিশ্বব্যাংক এবং (৩) এনজিও। তৃতীয়তঃ অর্থনীতির গতিপ্রকৃতির এবং অর্থনীতির পরিচালকদের ভূমিকায় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক জীবনের উপর প্রভাব নির্দিষ্টকরণ।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

এক। অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি

মোট জাতীয় উৎপাদন

বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি বোঝার জন্য প্রথমে মোট জাতীয় উৎপাদনের বৃদ্ধির পরিমাণগত দিক ও সেইসঙ্গে তার গুণগত দিক অর্থাৎ তার গঠনের পরিবর্তনের দিকে দৃষ্টিপাত করা দরকার। তবে এ কাজ করতে গিয়ে কিছু সমস্যার ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। পদ্ধতিগত সমস্যা এবং আওতা দুদিক থেকেই জিডিপি পরিমাপের সীমাবদ্ধতা আছে, এছাড়া দুর্বল তথ্যগত ভিত্তিতো আছেই। দেশে এখন এ রকম অনেক অর্থনৈতিক তৎপরতা আছে যেগুলো সরাসরি জিডিপি পরিমাপে ঠিকমতো প্রতিফলিত হয় না, উল্লেখ করা যায়- পারিবারিক শ্রম, নারীর 'গার্হস্থ' শ্রম-বাজার বহির্ভূত শ্রম, শিশু শ্রম, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত, তালিকা বহির্ভূত অর্থনৈতিক তৎপরতা, 'কালো' অর্থনীতি, পরিবেশগত ব্যয় ইত্যাদি। এসব সীমাবদ্ধতা মাথায় রেখেও আমরা প্রাপ্ত জিডিপি সংক্রান্ত তথ্য থেকে অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা পাই। বাংলাদেশ সরকারের হিসাব অনুযায়ী ১৯৭২ থেকে ১৯৯৮ সাল নাগাদ জাতীয় উৎপাদন ৪৯৮৫ কোটি টাকা থেকে বেড়ে চলতি বাজার দরে ১ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকায় উঠেছে। টাকার অংকে বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৪ গুণ।

স্বাধীনতার আগে জিডিপিতে কৃষির অংশ ছিল শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশি এবং শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি মানুষ কৃষির উপরই নির্ভরশীল ছিলেন। বাংলাদেশ তখন প্রকৃত অর্থেই কৃষিপ্রধান দেশ ছিল। ২৫ বছরে জিডিপির এই গঠনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ১৯৯৮ সালে কৃষির অবদান দাঁড়িয়েছে শতকরা ৩০ ভাগ, অর্ধেকের অনেক কম। অন্যদিকে কৃষির উপর নির্ভরশীল মানুষের শতকরা হার যদিও এখন পর্যন্ত শতকরা ৫০ ভাগের বেশি দেখা যায় তবুও পাশাপাশি এ কথাটি বিবেচনায় রাখতে হবে যে, এখন আর গ্রাম মানেই কৃষি নয়- গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষির অবদান আগে নিরঙ্কুশ থাকলেও এখন অকৃষি তৎপরতা গ্রামীণ অর্থনীতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক। কজেই কৃষির উপর নির্ভরশীল বলে চিহ্নিত জনগোষ্ঠীর বড় অংশের আয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ গঠিত হয় অকৃষি অর্থনৈতিক তৎপরতা থেকে। সুতরাং বাংলাদেশকে এখন আর কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করা চলে না।

১৯৭২ সালে অনেক ব্যবধান থাকলেও কৃষির পরই শিল্প, শতকরা হারে জিডিপিতে অবস্থান ছিল প্রায় ৯ ভাগ, ২৫ বছরের মাথায় জিডিপিতে শিল্পের অবদান দাঁড়িয়েছে ১০ ভাগের কিছু বেশি। উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা যায় সেবা,

নির্মাণ ও ব্যবসা খাতে। বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, বিভিন্ন ধরনের সেবা একত্রিত করলে এটাই একক বৃহত্তম খাত হয়, যা জিডিপির শতকরা ৫২ ভাগ। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় প্রতিষ্ঠার পরবর্তী ২৫ বছরে বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান অর্থনীতি থেকে সেবাপ্রধান অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে; শিল্পখাত মাঝখানে অর্থনীতিকে কোনভাবে পরিচালনার শক্তি দেখাতে পারেনি। অর্থনীতির মূল চেহারা তার ফলে ব্যবসা ও সেবা খাত দ্বারাই নির্ধারিত হচ্ছে । পেশা, আয়ের উৎস ইত্যাদি ক্ষেত্রেও এর প্রভাব সুস্পষ্ট ।

৯০ দশকের বছরগুলোতে গড় জাতীয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা যায়। জাতীয় সঞ্চয়ের অগ্রগতিতে বিদেশ থেকে পাঠনো প্রবাসীদের টাকার একটি বড় ভূমিকা আছে। বিনিয়োগের হার বৃদ্ধির ধরনও গুরুত্বপূর্ণ। উৎপাদনশীল খাতগুলোতে বিনিয়োগের হার উঁচু নয়। এগুলো বিবেচনা করলে বোঝা যাবে কেন বিনিয়োগের মোটামুটি উচ্চ হার হার এবং উৎপাদনশীল খাতের স্থবিরতা ও তথাকথিত বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা এক সঙ্গেই অবস্থান করে।

কৃষি

বাংলাদেশের কৃষির চেহারা এককথায় বহুমাত্রিক। কৃষির একটি চেহারা মূলতঃ এদেশের মাটি, পরিবেশ ও মানুষের অব্যাহত মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। কৃষির এই চেহারা এদেশে দীর্ঘদিনের জীববৈচিত্র ও মানুষের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে বাংলাদেশের বর্তমান কৃষির প্রধান চেহারা গঠন করেছে ৬০ দশকে বিশ্বব্যাপী 'সবুজ বিপ্লব' নামে উফশী বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ঔষধ ও যান্ত্রিক সেচ সম্বলিত যে কৃষি ব্যবস্থা অন্যান্য দেশের মতো এদেশেও প্রবেশ করেছিল সেটিই।

স্বাধীনতা-উত্তর কালের তথ্য থেকে দেখা যায় যে, আমন ও আউশ ধানের জমি কমেছে, বোরো ও গমের বেড়েছে। অন্যদিকে পাটের জমি কমেছে। উৎপাদনশীলতা পরীক্ষা করলে আমরা দেখি ১৯৭০ থেকে ২৫ বছরে আমন, আউশ, বোরো ও গমের উৎপাদনশীলতা বেড়েছে যথাক্রমে শতকরা ৩০.১৯, ২৩.৩৯, ১২.৯৭, ১২৪.৮৪ ভাগ। কিন্তু একই সময়ে সারের ব্যবহার বেড়েছে ৭৬৪.৮৪% এবং সারের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা প্রায় ১৩০০ ভাগ। উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে। বিভিন্ন ফসলের মুনাফার হারের হিসাবে দেখা যায় এক উফশী আমন ছাড়া দেশী আমন ও উফশী বোরোতে মুনাফার হার কমেছে।

সারণী-১। কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি

(একর প্রতি ফলনঃ মণ)

শস্য	১৯৬৯-৭০	১৯৭৮-৭৯	১৯৮৫-৮৬	১৯৯৪-৯৫	২৫ বছরে বৃদ্ধির হার (%)
আমন	১২.৭৫	১৪.০৯	১৫.৩৩	১৬.৬০	৩০.১৯
আউশ	৯.৫৩	১১.২৭	১০.৬৭	১১.৭৬	২৩.৩৯
বোরো	২৩.৭৩	১৯.৮৩	২৫.৯১	২৬.৮১	১২.৯৭
গম	৯.৪৬	২০.২৩	২১.৭৮	২১.২৭	১২৪.৮৪

সূত্র ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ১৯৮০, ৮১, ৯০, ৯১, ৯৬।

দেশে কৃষি আবাদের অভিজ্ঞতাকে অধিকতর গবেষণা ও চর্চার মাধ্যমে না এগিয়ে কৃষিকে আমদানী করা বিপদজনক প্রযুক্তির মুখে ফেলে দেয়ার পেছনে এদেশের উন্নয়ন দর্শন, আন্তর্জাতিক পুঁজির ভূমিকা, শাসক শ্রেণীর অবস্থান ইত্যাদি বরাবরই কার্যকর ছিল। প্রথমে বিদেশী সাহায্য ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে ভর্তুকী দিয়ে এই কৃষি ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। কৃষকরা এই ব্যবস্থায় অভ্যস্ত কিংবা আরও সুনির্দিষ্টভাবে এর উপর নির্ভরশীল হয়ে যাবার পর ভর্তুকী ক্রমাগত তুলে নেয়া হচ্ছে। এই আমদানী করা প্রযুক্তি চালু করবার ক্ষেত্রে যে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ছিল মূখ্য, সেই বিএডিসিও ক্রমেই বাহুল্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে ব্যবহৃত রাসায়নিক সারের পরিমাণ ছিল ৩,৮৪,০০০ টন, ১৯৮৫-৯৬ সালে এটি পৌছায় ২৯, ৩৭,০০০ টনে অর্থাৎ এই সময়কালে বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৭ গুণ (বিবিএস, ১৯৯৬)। ১৯৬৮-৬৯ সালে ইউরিয়া ও টিএসপি'র জন্য ভর্তুকীর গড়পড়তা হার ছিল ৫৮%। ১৯৭৬ সালে ইউরিয়ার জন্য এটি দাঁড়ায় শতকরা ৫২ ভাগ এবং ৭০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে সরকারী বাজেটের শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ খরচ হতো কৃষিখাতে, যার প্রায় ২৮ ভাগই খরচ হতো সারের ভর্তুকীতে (হোসেন, ১৯৯৫)। ৭০ দশকের শুরু থেকেই ভর্তুকী হ্রাসের জন্য 'দাতা' সংস্থাসমূহের পরামর্শ বাড়তে থাকে। ১৯৭৫ সালে গড়পড়তা ভর্তুকী হার ছিল শতকরা ৫৭ ভাগ, ৮৪সালে এটি কমে দাঁড়ায় শতকরা ২৫ ভাগ। ক্রমাগতঃ ভর্তুকী হ্রাসের কারণে দামও বাড়তে থাকে। ১৯৭২ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্তই সারের দাম বাড়ে ১০ গুণ।

স্বাধীনতার পর কৃষি উৎপাদনের এই মডেলটি দ্রুত বিকাশ লাভ করেছে। বর্তমানে অর্থনীতির বিকাশের সঙ্গে সার, কীটনাশক ও যান্ত্রিক সেচকে অবিচ্ছেদ্য হিসাবেই বিবেচনা করা হয়। কৃষিতে এই 'আধুনিক' প্রযুক্তির প্রয়োগ

সারণী-১৭ কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি

(একর প্রতি ফলনঃ মণ)

শস্য	১৯৬৯-৭০	১৯৭৮-৭৯	১৯৮৫-৮৬	১৯৯৪-৯৫	২৫ বছরে বৃদ্ধির হার (%)
আমন	১২.৭৫	১৪.০৯	১৫.৩৩	১৬.৬০	৩০.১৯
আউশ	৯.৫৩	১১.২৭	১০.৬৭	১১.৭৬	২৩.৩৯
বোরো	২৩.৭৩	১৯.৮৩	২৫.৯১	২৬.৮১	১২.৯৭
গম	৯.৪৬	২০.২৩	২১.৭৮	২১.২৭	১২৪.৮৪

সূত্র ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ১৯৮০, ৮১, ৯০, ৯১, ৯৬।

দেশে কৃষি আবাদের অভিজ্ঞতাকে অধিকতর গবেষণা ও চর্চার মাধ্যমে না এগিয়ে কৃষিকে আমদানী করা বিপদজনক প্রযুক্তির মুখে ফেলে দেয়ার পেছনে এদেশের উন্নয়ন দর্শন, আন্তর্জাতিক পুঁজির ভূমিকা, শাসক শ্রেণীর অবস্থান ইত্যাদি বরাবরই কার্যকর ছিল। প্রথমে বিদেশী সাহায্য ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে ভর্তুকী দিয়ে এই কৃষি ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। কৃষকরা এই ব্যবস্থায় অভ্যস্ত কিংবা আরও সুনির্দিষ্টভাবে এর উপর নির্ভরশীল হয়ে যাবার পর ভর্তুকী ক্রমাগত তুলে নেয়া হচ্ছে। এই আমদানী করা প্রযুক্তি চালু করবার ক্ষেত্রে যে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ছিল মূখ্য, সেই বিএডিসিও ক্রমেই বাহুল্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে ব্যবহৃত রাসায়নিক সারের পরিমাণ ছিল ৩,৮৪,০০০ টন, ১৯৮৫-৯৬ সালে এটি পৌছায় ২৯, ৩৭,০০০ টনে অর্থাৎ এই সময়কালে বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৭ গুণ (বিবিএস, ১৯৯৬)। ১৯৬৮-৬৯ সালে ইউরিয়া ও টিএসপি'র জন্য ভর্তুকীর গড়পড়তা হার ছিল ৫৮%। ১৯৭৬ সালে ইউরিয়ার জন্য এটি দাঁড়ায় শতকরা ৫২ ভাগ এবং ৭০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে সরকারী বাজেটের শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ খরচ হতো কৃষিখাতে, যার প্রায় ২৮ ভাগই খরচ হতো সারের ভর্তুকীতে (হোসেন, ১৯৯৫)। ৭০ দশকের শুরু থেকেই ভর্তুকী হ্রাসের জন্য 'দাতা' সংস্থাসমূহের পরামর্শ বাড়তে থাকে। ১৯৭৫ সালে গড়পড়তা ভর্তুকী হার ছিল শতকরা ৫৭ ভাগ, ৮৪সালে এটি কমে দাঁড়ায় শতকরা ২৫ ভাগ। ক্রমাগতঃ ভর্তুকী হ্রাসের কারণে দামও বাড়তে থাকে। ১৯৭২ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্তই সারের দাম বাড়ে ১০ গুণ।

স্বাধীনতার পর কৃষি উৎপাদনের এই মডেলটি দ্রুত বিকাশ লাভ করেছে। বর্তমানে অর্থনীতির বিকাশের সঙ্গে সার, কীটনাশক ও যান্ত্রিক সেচকে অবিচ্ছেদ্য হিসাবেই বিবেচনা করা হয়। কৃষিতে এই 'আধুনিক' প্রযুক্তির প্রয়োগ

ও বিস্তারের ফলাফল অনেকদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এর একটি হল উফশী বীজের মাধ্যমে ধান উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি- ২৫ বছরে ধান উৎপাদন যে প্রায় দুইগুণ বেড়েছে তার পেছনে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু একই ঘটনার অন্যান্য ফলাফল বা প্রভাব নিয়ে আলোচনা বা গবেষণা খুবই কম হয়েছে। এগুলো হল (ক) অনেক প্রজাতির ধানের অবলুপ্তি, (খ) রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধের ব্যবহারের কারণে মাটি ও পানিতে বিরূপ দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া; যার প্রভাবে মাটির উর্বরতা হ্রাস, মৎস্য সম্পদের বিপুল ক্ষতি, (গ) প্রাণবৈচিত্রের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও নতুন নতুন পোকামাকড়ের আমদানী, (ঘ) ভূগর্ভস্থ পানি হ্রাস, (ঙ) কৃষকের প্রকৃতি-নির্ভর অভিজ্ঞতার অপচয় এবং (চ) ফসলের বৈচিত্র হ্রাস।

শিল্প

স্বাধীনতার আগে বাংলাদেশে যে শিল্প ভিত্তি গড়ে উঠেছিল তার বয়সও খুব বেশিদিনের নয়। মধ্যপঞ্চাশ দশকে এদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্যোগ নেয়া হয় এবং তার প্রভাবেই পাট, বস্ত্র, কাগজ, চিনি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বেশকিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। পূর্ব পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন সংস্থার (ইপিআইডিসি) পৃষ্ঠপোষকতায় ৭৪টি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে, বেশির ভাগই ছিল পাটশিল্প। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য দিক হলো মূলধন গঠনে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার হার ছিল সাধারণভাবে শতকরা ৭০ ভাগ, কোন কোন ক্ষেত্রে শতকরা ৯২.৫ ভাগ। এভাবে যে শিল্পভিত্তি গড়ে উঠে তার মধ্যে বিশেষভাবে পাটখাত ছিল আবার কৃত্রিমভাবে লাভজনক। রপ্তানি বোনাস ভাউচার স্কীম বিবেচনা করলে এই বেসরকারী শিল্পভিত্তি ছিল লোকসানী খাত, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় মালিকদের জন্য যা ছিল লাভজনক। এই শিল্পখাত আবার প্রধানতঃ ছিল তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানী বৃহৎ পুঁজির নিয়ন্ত্রণে। স্বাধীনতার পর পরিত্যক্ত এসব শিল্প জাতীয়করণ করা হয়। এর ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতই হয়ে দাঁড়ায় শিল্পের মূলধারা। মোট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি ছিল সরকারী খাতে, যেগুলোকে ৭টি সংস্থার অধীনে বিন্যস্ত করা হয়।

বেসরকারী খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ছিল, সিলিং দেয়া ছিল ২৫ লাখ টাকা। বলাই বাহুল্য যে, সিলিং না থাকলেও সে সময় বিনিয়োগ করবার মতো বাঙালী উদ্যোক্তা পাওয়া কঠিন হতো। তবে শিল্প ও বাণিজ্যের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ এবং দেশে নতুন সম্পত্তিশালী শ্রেণী গঠিত হবার প্রক্রিয়ায় মূলধন সংবর্ধন মূলতঃ 'বেআইনী' ধারাতেই সংগঠিত হয়। এর

প্রতিফলনই ক্রমান্বয়ে সিলিং পরিবর্তনের মধ্যে দেখা যায়। ১৯৭৪ সালে ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগের সিলিং পরিবর্তন করে ৩ কোটি টাকায় নির্ধারণ করা হয়, ১৯৭৫ সালে এটি হয় ১০ কোটি টাকা এবং ১৯৭৭ সালে এটি পুরোপুরি প্রত্যাহার করা হয়। ১৯৭৭, ১৯৮২, ১৯৮৬ ও ১৯৯১ সালে যেসব শিল্পনীতি ঘোষিত হয় সেগুলোর লক্ষ্য মূলতঃ এক একরৈখিক-রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের প্রাধান্য কমানো, দেশী-বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাধা অপসারণ ও এগুলোর ক্ষেত্রে সরকারী নানা সমর্থন সম্প্রসারণ। ১৯৯১ সালের মধ্যে বেসরকারী খাতে বিনিয়োগের উপর বিধিনিষেধ পুরোটাই উঠে যায়।

সারণী-২। শিল্প খাতের উৎপাদন সূচক, ১৯৯৪-৯৫

দ্রব্য	১৯৮৫-৮৬ ভিত্তিঃ১৯৭৩-৭৪=১০০)	১৯৮৯-৯০ (ভিত্তিঃ১৯৭৩-৭৪=১০০)	১৯৯৪-৯৫ (ভিত্তিঃ১৯৮১-৮২=১০০)
সাধারণ সূচক	১৪০.৪০	১৬৫	২৬২
খাদ্যদ্রব্য, তামাক ও পানীয়	১১৩.২৭	২১২	১৫৩
বস্ত্র উৎপাদন (পাট ও সূতা)	১০৫.৯	১০৯	২৮৮
এর মধ্যে গার্মেন্টস	-	-	১৪৫৬৪
কাগজ ও কাগজ জাতীয় দ্রব্য	১৫৫.১৭	১৬৯	৩২৫
রাসায়নকি দ্রব্য	২৮৩.৮৪	৩৯৩	২৭৬

সূত্রঃ বিবিএস, ১৯৮৬,১৯৯০,১৯৯৬।

এই পুরো সময় জুড়ে বেসরকারী খাতের উৎপাদনশীল বিকাশ এবং বিদ্যমান সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহ বিরাষ্ট্রীয়করণের তফাৎটি তাৎপর্যপূর্ণ। বেসরকারী খাতের বিকাশ ঘোষিত লক্ষ্য হলেও বরাবর সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহ বিরাষ্ট্রীয়করণই মূল মনোযোগের বিষয় ছিল। প্রথমদিকে লোকসানী প্রতিষ্ঠানগুলো বেসরকারী খাতে দিয়ে সরকারের ভর্তুকী কমানোর লক্ষ্য নির্দেশ করা হলেও ক্রমে লাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলো বিরাষ্ট্রীয়করণ করবার ব্যাপারেই বেশি আগ্রহ দেখা যায়। তাছাড়া, বহুমুখীকরণ ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে লাভজনক করবার সুযোগকে উপেক্ষা করে লোকসানের অজুহাতে পাটশিল্পকে বিলুপ্ত করবার ব্যাপারে বিশ্বব্যাংকের আগ্রহ ও অর্থায়নের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবেই বিভিন্ন সরকার ভূমিকা পালন করেছে।

১৯৭৪ থেকে ২৫ বছরের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখি, রাষ্ট্রীয়করণ ও বিরাষ্ট্রীয়করণ উভয় ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত ও তার বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়ন উত্তর ফলাফলের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা আছে। রাষ্ট্রায়াত্ত ও বেসরকারী উভয়খাতে তাই আমরা একই ভাবে ক্ষমতার অব্যবহার, অ-বহুমুখীকরণ, রাষ্ট্রীয় ভর্তুকীর উপর নির্ভরশীলতা, নিম্ন উৎপাদনশীলতা, কারিগরি ও ব্যবস্থাপনার দিক থেকে পশ্চাৎপদতা দেখতে পাই। ১৯৯১ সালে গঠিত টাস্ক ফোর্স রিপোর্টে সঠিকভাবেই বলা হয়েছে, "শিল্পে রুগ্নতা যা এখন প্রায় শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি অব্যাহত আছে। ঋণদানকারী সংস্থার টাকা অনেকেই পরিশোধ করছে না, কিন্তু এর ফলে ঋণের যে সংকোচন হচ্ছে তাতে ক্ষতিগস্থ হচ্ছে প্রকৃত শিল্পপতিরা। চোরাচালানী এখন ব্যবসার চাইতে বেশি লাভজনক, এবং ব্যবসা শিল্পের চাইতে বেশি লাভজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্প থেকে সম্পদ স্থানান্তরিত হচ্ছে ব্যবসা ও অন্যান্য খাতে, ফলে দীর্ঘমেয়াদে শিল্পায়নের আশা একটা মায়া হয়ে দাঁড়িয়েছে" (টাস্কফোর্স, খন্ড১)।

সরকারী খাতে যেসব শিল্প-প্রতিষ্ঠান ছিল এবং আছে সেগুলোতে লুটপাট ও লোকসান সম্পর্কে সকল সরকারের এবং বিশ্বব্যাংকের বক্তব্য অভিন্ন। নীতি-নির্ধারণকারী অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোরও সব সময়ই এ ব্যাপারে ঐকমত্য দেখা যায়। সকলের বক্তব্যেই এসব সংস্থাসমূহ বেসরকারী খাতে যতদ্রুত দিয়ে দেবার ব্যাপারেও অভিন্ন সিদ্ধান্ত দেখা যায়। কিন্তু যে বক্তব্য এদের কারও কাছ থেকে পাওয়া যায় না সেটি হল এসব সংস্থার লোকসান-লুটপাট- অদক্ষতার কারণ অনুসন্ধান এবং এই লোকসানের জন্য দায়ী ব্যক্তিবর্গ ও অন্যান্য কারণ চিহ্নিত করা। কোনরকম পর্যালোচনাহীনভাবে বেসরকারীকরণ যে কোন নতুন গতি সৃষ্টি করতে পারেনি বরঞ্চ "সোনার" ডিমের হাঁসের ভূমিকা পালন করে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান যে বন্ধ হয়ে গেছে তার কারণও তাই সহজেই বোধগম্য।

সারণী-৩। শিল্পখাতে ক্ষমতা ব্যবহারের মাত্রা

ব্যবহারের মাত্রা	০-২৫%	২৬-৫০%	৫১-৭৫%	৭৬-১০০%	১০১-১৫০%
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১০৪২	৫৩৬৪	৯১৮৭	৭৩৬৬	-
শতকরা হার (%)	৪.৪৯	২৩.১৪	৩৯.৭৬	৩১.৬৭	১.০১

সূত্র ঃ বিশ্বব্যাংক ও ইউএসআইডি, ১৯৯৬

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকারখানায় প্রায় ৩ দশকে প্রযুক্তিগত কোন বিকাশ ঘটানো হয়নি, নতুন পুঁজি বিনিয়োগও হয়নি। বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে ক্ষমতার তুলনায় তার ব্যবহার হয়েছে কম। তার ফলে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে লোকসান প্রায় নিয়মিত ঘটনা। ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে এই লোকসানের পরিমাণ ৫৫২.১৮ কোটি টাকা অন্যদিকে ৩০ জুন ১৯৯৬ পর্যন্ত এসব সংস্থা থেকে ছাঁটাইকৃত শ্রমিকের সংখ্যা ৭১,৮৮৭ জন। ১৯৯৮-৯৯ সালে লোকসান ১২০০ কোটি টাকারও বেশী। অন্যদিকে এরমধ্যে বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে বেকার ও ছাঁটাইকৃত শ্রমিকের সংখ্যা লক্ষ অতিক্রম করেছে।

বিরাষ্ট্রীয়করণের ব্যাপারে উন্মাদনা বা অস্থিরতা এই পর্যায়ে গেছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ন্যূনতম নিয়মকানুনও রক্ষা করা হয়নি, প্রকৃত দামের চাইতে অনেক কম দামে এবং উপরন্তু সরকারী নানা সুবিধা দিয়ে এগুলো ব্যক্তি মালিকানায় দেয়া হয়েছে যে তাকে বিলিয়ে দেয়া বা হরিলুট বলা অত্যুক্তি হবে না। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, "২৯টি পাটকল যার দাম বিজেএমসির হিসেবে ২৪৫ কোটি টাকা তা ব্যাক্তমালিকানায় দেয়া হয়েছে মাত্র ৫.৫ কোটি টাকায়" (আবদুল্লাহ, ১৯৯১ঃ ২৮-২৯)। এরকম সম্পদ স্থানান্তরের পরিণাম হিসেবে যে বেসরকারী খাত দাঁড়িয়েছে তা প্রথম থেকেই বিকলাঙ্গ এবং শিল্পবিদ্বেষী। বিরাষ্ট্রীয়কৃত প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলোই পরে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। টাস্কফোর্স রিপোর্ট অনুযায়ী ৮০ দশকে "যখন বাণিজ্য ও সেবায় বিনিয়োগের তুলনায় বেসরকারী শিল্পখাতে বিনিয়োগ ৪ গুণ হবার কথা বলা হয়েছে তখন বাস্তবে ঘটেছে ঠিক উল্টোটি" (পূর্বোক্ত)। ৭০ দশকের শেষ থেকেই শিল্পখাতের গঠনের মধ্যে পরিবর্তনের সূচনা দেখা যায়। পুরনো শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো ভাঙ্গনের সম্মুখীন হয়। সরকার এসব প্রতিষ্ঠানে নতুন বিনিয়োগ থেকে বিরত থাকে। কোন প্রযুক্তিগত বা ব্যবস্থাপনাগত বিকাশ ঘটেনি, পুরনো প্রযুক্তি-পুরনো ব্যবস্থাপনা-বৈচিত্র্যকরণের অভাব-অনিশ্চয়তা-লুটপাট সবমিলিয়ে এই প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বসে পড়তে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে অর্থনীতির উপর একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াতে থাকে। বিভিন্ন সরকার ও বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এই বোঝা হয়ে দাঁড়ানোর ব্যাপারটি নিয়ে যতটা উচ্চ কণ্ঠ থেকেছে ততটাই নীরব থেকেছে এর কারণ সম্পর্কে। তার ফলে এসব শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যেগুলো ব্যক্তি মালিকানায় গেছে সেগুলো মালিকদের সরকারী নানা সুবিধা দান করলেও কিংবা সেগুলোর সুবাদে ব্যাংকঋণের উদার সুবিধা পেয়ে মালিকরা স্ফীত হলেও অধিকাংশ শিল্পপ্রতিষ্ঠান একই ধরনের বিপর্যস্ত পরিণতি লাভ করে।

শিল্পখাতে সরকারী ভূমিকা বেসরকারী পর্যায়েও বিনিয়োগের ধরন ও গতিমুখের উপর প্রভাব ফেলে। শিল্পের চাইতে বাণিজ্য ও সেবা এবং শিল্পখাতের মধ্যে রফতানীমুখী-হালকা প্রযুক্তিনির্ভর-শ্রমনির্ভর-ঠিকাদারী ধাঁচের শিল্পপ্রতিষ্ঠানের দিকে বিনিয়োগ বেশী হয়। এর ফলে একদিকে পাট, বস্ত্র, চিনি, কাগজ, ষ্টিল শিল্পগুলোর ক্ষয় দেখা যায় এবং বিকাশ দেখা যায় গার্মেন্টস, ইলেক্ট্রনিক্স শিল্পের। সেজন্য এসব শিল্পে প্রবৃদ্ধির হার গড় প্রবৃদ্ধির হারের চাইতে বেশী। ১৯৯৪-৯৫ সালে সমগ্র শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৩.২% কিন্তু গার্মেন্টস হিসাব থেকে বাদ দিলে হার গাঁড়ায় ৮.৩% (সিপিডি, ১৯৯৫ঃ১৯৫)।

শিল্পে মূলধনের চাহিদার দিক বোঝার জন্য শিল্পে ব্যাংকঋণ বিবেচনা করা যায়, সেটা বিবেচনা করলে গত ২০ বছরে শিল্পে বিনিয়োগ এবং তার প্রসার অনেক বেশি হবার কথা। একদিকে মূলধনের এই সরবরাহ এবং অন্যদিকে পুরনো শিল্পপ্রতিষ্ঠানের রুগ্নদশা ও নতুন শিল্পখাতে শ্লথ বিনিয়োগ মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাছাড়া শিল্পে বিনিয়োগ বাড়লে যন্ত্রপাতি আমদানি, বিদ্যুৎ ব্যবহার ইত্যাদির মধ্যেও তার প্রভাব পড়বার কথা। আগে তো বটেই, ৯০ দশকের প্রথম দিকেও এসব ক্ষেত্রে কোন সঙ্গতিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়নি(সিপিডি, ১৯৯৫)।

পাশাপশি রাজধানীর প্রান্ত বা শহরতলীতে এবং থানা শহরগুলোতে এমন বহুসংখ্যক ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠান আছে এবং নগরায়নের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর বিস্তারও ঘটেছে যেগুলোতে পুঁজির অনুপাত কম, আমদানিকৃত প্রযুক্তির ব্যবহার কম এবং সাধারণতঃ পারিবারিকভাবে এখানে কাজ হয়, ব্যবস্থাপনাও সেভাবে গঠিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিও দেশেরই প্রায় একই ধরনের শিল্পে তৈরী। এরকম অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান আছে যেগুলো আইনবহির্ভূত, জিডিপির হিসাব বহির্ভূত। এসব শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রধানতঃ দেশীয় বাজারের উদ্দেশ্যে উৎপাদন করে থাকে, এগুলো সবচাইতে বেশি সৃজনশীলতা ও গতিশীলতার পরিচয় দিলেও সরকারী আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতার নানা ব্যবস্থার বাইরে। ব্যাংকঋণ, কর মওকুফ, অবকাঠামোগত সুবিধা ইত্যাদি কোন কিছুই এরা পায় না। এসব প্রতিষ্ঠানে যুক্ত শ্রমশক্তির সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচির অধীনে আমদানি অবাধকরণে এদের লাভ নেই, কারণ এরা আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি বা কাঁচামাল খুবই কম ব্যবহার করে, বরঞ্চ আমদানি অবাধ হওয়াতে তাদের অসম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হয়। আবার মুদ্রা অবমূল্যায়নে রপতানিমুখী প্রতিষ্ঠানগুলোর লাভ হয় কিন্তু এদের তাতে লাভ নেই, কেননা এরা রফতানির জন্য উৎপাদন করে না। বরঞ্চ মুদ্রা অবমূল্যায়নে আমদানি ব্যয় বেড়ে যাবার ফলে এদের উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যায়।

বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রদত্ত সুবিধাদি ক্রমে অনেক বিস্তৃত করা হয়েছে। ১৯৭৭ সালে রফতানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল খোলা শুরু হয়। ক্রমান্বয়ে এই অঞ্চলই শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগের প্রধান ক্ষেত্রে পরিণত হয়। ১৯৭৭ সাল থেকে বিদেশী বিনিয়োগের গতিমুখ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, মোট বিনিয়োজিত বিদেশী বিনিয়োগের শতকরা ২৩.৭৬ ভাগ শিল্পখাতে গেছে, শতকরা ৬৯.১১ ভাগ গেছে ব্যবসায়। এখানে যে বিনিয়োগ হয়েছে তার বেশিরভাগই এক্ষেত্রে পূর্বে পুঁজি থেকে প্রাপ্ত আয় থেকেই করা হয়েছে। নীট মুদ্রা পুঁজির অন্তঃপ্রবাহ বা মূলধনী দ্রব্যাদি আমদানি হয়েছে খুবই কম, মাত্র ১২.৮% (বাংলাদেশ ব্যাংক, ১৯৯০; রেজা,১৯৯৫)।

গত কয়েক বছরে শিল্পখাতে বিনিয়োগের একক বৃহৎ এবং বিদেশী বিনিয়োগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কাফকোতে বিনিয়োগ। সামগ্রিকভাবে রফতানি অঞ্চলও এর পরে। অবশ্য রফতানি অঞ্চলে বিনিয়োগকে ছাড়িয়ে গেছে স্টক মার্কেটে বিনিয়োগ। কয়েক বছরের প্রবণতা থেকে এ ধারণা করা যায় যে, এই খাতটিই বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য উর্বর ক্ষেত্র হিসেবে বিবিচিত। ২৫ বছরের শেষ পর্যায়ে শেয়ার বাজার নিয়ে যে তুলকালাম কান্ড হয়েছে এবং যা এক পর্যায়ে গিয়ে ক্রাশের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীকে সর্বশান্ত করেছে সাময়িক তদন্তে তার পেছনে মূল ক্রিয়াশীল হিসেবে পাওয়া গেছে চারটি বিদেশী কোম্পানীকে (ভোরের কাগজ, ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৯৬)। স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যদের দিয়ে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির মাধ্যমে অল্প সময়ে বিপুল লাভ করে দেশ ত্যাগ করেছে। তেল ও গ্যাস ক্ষেত্রে বিপুল বিদেশী বিনিয়োগ ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু এই বিনিয়োগের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ প্রকৃতপক্ষে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে না। উপরন্তু এই বিনিয়োগ বিশ্লেষণ করলে এর স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে, ক্ষতিকর-উৎপাদনবিরোধী দিকগুলো স্পষ্ট হবে।

বাণিজ্য

বাণিজ্য ক্ষেত্রেও স্বাধীনতা উত্তর ২৫ বছরে পরিমাণগত ও গুণগত বেশকিছু পরিবর্তন দেখা যায়। বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একরৈখিক ধারা অবশ্য এরমধ্যেও অব্যাহত থেকেছে। ১৯৭২-৭৩ সালে বাণিজ্য ঘাটতি ছিল প্রায় ৪৩৫ কোটি টাকা, ১৯৯৫-৯৬ সালে এসে তা দাঁড়িয়েছে ২০গুণেরও বেশি। আমদানি বাণিজ্যের গঠনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এ সময়ে দেখা যায়নি। ভোগ্যপণ্যের আধিক্য এখনও আমদানি তালিকায় প্রবল, তালিকার চাইতেও বাস্তবে তার অনুপাতে বেশি বলে ধারণা করবার যথেষ্ট কারণ আছে। তবে রপ্তানি আয়ের উৎসে পরিবর্তনসাধিত হয়েছে।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে 'সোনালী আঁশ' বলে কথিত পাটই ছিল রপ্তানি আয়ের প্রধান উৎস, এছাড়া অন্যান্য প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ছিল পাটজাত দ্রব্য, চা, চামড়া ইত্যাদি। ৮০ দশক থেকে এ পরিস্থিতির মধ্যে পরিবর্তনের সূচনা হয় এবং ক্রমান্বয়ে তৈরী পোশাক প্রধান রপ্তানি পণ্যে পরিণত হয়। ১৯৮০ সালে মোট রপ্তানির মধ্যে তৈরী পোশাকের অংশ ছিল শতকরা ২ ভাগ, ১৯৯৫ সাল নাগাদ এর অংশ হয়েছে শতকরা ৬১ ভাগ। অন্যদিকে পাট একই সময়কালে শতকরা ৬২ ভাগ থেকে নেমে ১২ ভাগে পৌঁছেছে। রপ্তানি পণ্যের মূলধারায় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রপ্তানি অঞ্চলেও পরিবর্তন দেখা যায়। তৈরী পোষাকের মূল রপ্তানি অঞ্চল হচ্ছে ইউরোপীয়ান অঞ্চল (প্রায় ৯৫%)।

সারণী ৪। রপ্তানি বাণিজ্যের ধরন

(মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা হার)

রপ্তানি পণ্য	বছর			
	১৯৮২-৮৩	১৯৮৫-৮৬	১৯৯০-৯১	১৯৯৪-৯৫
তৈরী পোশাক	২	১৬	৪৩	৬১
চামড়া	৮	৭	৮	৭
হিমায়িত মাছ ও চিংড়ি	১০	১৪	৮	১০
পাট ও পাটজাত দ্রব্য	৬২	৫৫	২৭	১২
চা	৭	৪	২	১
অন্যানা	১১	৪	১২	১০

সূত্র ঃ বিবিএস, ১৯৯৪; সিপিডি ১৯৯৫।

স্বাধীনতার পরপর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সরকারের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ থাকলেও ক্রমেই তা শিথিল হয়েছে। বর্তমানে মোট আমদানির শতকরা ৮১ ভাগ হয় সম্পূর্ণ বেসরকারী খাতে, অন্যদিকে রপ্তানির শতকরা ৯৭ ভাগ বেসরকারী খাতেই করা হয় (বিবিএস, ১৯৯৬)। বেসরকারী খাতে এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও গত দুই দশকে একচেটিয়াকরণ হয়েছে উল্লেখযোগ্য মাত্রায়। ১৯৮৫-৮৬ সালে মোট আমদানিকারকের সংখ্যা ছিল ৪০,০০০। দেশে বৃহৎ আকারের ইন্ডেন্টরের সংখ্যা মাত্র ৭৪ জন। আরও সুনির্দিষ্ট তথ্য থেকে দেখা যায়, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের শতকরা ৮০ ভাগ ইন্ডেন্টিং ঠিকাদারীর দায়িত্ব পেয়েছে মাত্র ৬টি বড় ইন্ডেটিং ফার্ম (আব্দুল্লাহ, ১৯৯১ঃ৩১-৩৩)। শিথিল বা প্রত্যাহার করা হয়েছে আমদানি রপ্তানির উপর নানা ধরনের বিধিনিষেধ। ১৯৮৫-৮৬ সালে পুরোপুরি নিষিদ্ধ, নিয়ন্ত্রিত বা নানা রকম নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ছিল ৪৭৮টি বিষয়, ১৯৯৩-৯৮ সালের মধ্যে ৩৬৯টির উপর থেকে সবরকম নিয়ন্ত্রণ তুলে নেয়া হয়। সমগ্র অর্থনীতিতে ১৯৮৯ সালে সংরক্ষণ হার ছিল শতকরা ৯৪ ভাগ, ১৯৯৫ সালে তা

দাঁড়ায় শতকরা ৩০ ভাগ (ইলমাজ ও ভর্মা)। এর ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ভোগ্যপণ্য আমদানির প্রবাহকে তা শক্তিশালী করেছে। নীচের সারণীতে আমদানি বাণিজ্যের কাঠামো থেকে সুস্পষ্টভাবে দেখা যাবে প্রথমতঃ ভোগ্যপণ্যই আমদানি বাণিজ্যের প্রধান অংশ এবং দ্বিতীয়তঃ এই আমদানির বৃদ্ধির হারও সবচাইতে বেশি।

সারণী ৫। আমদানি বাণিজ্যের ধরন (%)

আমদানি পণ্যের ধরন	বছর				হ্রাসবৃদ্ধি (%)
	১৯৮০-৮১	১৯৮৫-৮৬	১৯৯০-৯১	১৯৯১-৯২	
ভোগ্যপণ্য	১৭.৯	৩২.৮	৩৪.৭	৩৯.১৭	+১১৮.৮২
ভোগ্যপণ্যের দ্রব্যাদি	৪০.৩	৩৬.১	৩০.১	৩০.২৯	-২৪.৮৪
মূলধনী পণ্য	২৬.৯	১২.৩	১৪.৪	১২.৫৭	-৫৩.৩৮
মূলধনীপণ্যের দ্রব্যাদি	১৪.৯	১৮.৯	২০.৮	১৭.৯৭	+২০.৬০

সূত্রঃ বিবি এস, ১৯৯৪ থেকে তৈরী।

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য বেড়েছে। তবে আইনি বাণিজ্যের তুলনায় বেআইনি বাণিজ্যই বেড়েছে বেশি। ১৯৯৩-৯৪ সালের বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্যের উপর এক গবেষণায় দেখা যায় আইনি ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি যেখানে প্রায় ১৬০০ কোটি টাকা ছিল সেখানে বেআইনি বাণিজ্য ঘাটতি ছিল প্রায় ২০০০ কোটি টাকা (সারণী ৬)।

সারণী ৬। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ভারসাম্য, ১৯৯৩-৯৪

বিষয়	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
আইনি আমদানি	১৬৬০.২৬
আইনি রপ্তানি	৮৪.৪২
আইনি বাণিজ্য ঘাটতি	১৫৭৫.৮৫
বেআইনি আমদানি (বেআইনি রাস্তা)	২০৮৬.৩৮
বেআইনি আমদানি (আইনি রাস্তা)	৪১৪.১৬
মোট বেআইনি আমদানি	২৫০০.৪৪
বেআইনি রপ্তানি	৫০৬.৫২
বেআইনি বাণিজ্য ঘাটতি	১৯৯৩.৯২
ভারতের সঙ্গে মোট বাণিজ্য ঘাটতি	৩৫৬৯.৭৬

সূত্রঃ বখত, ১৯৯৬।

বিদেশী 'সাহায্য'

স্বাধীনতার ঠিক পরপর বিদেশী 'সাহায্য' তহবিল যোগানের উপর নির্ভরশীলতা বিরোধী যে মেজাজ সমাজে এমনকি সরকারের মধ্যে শক্তিশালী ছিল তা অন্ততঃ সরকারী মহলে কেটে যেতে সময় লাগেনি। বাংলাদেশ খুব দ্রুত 'বিদেশী সাহায্য' নামের আন্তর্জাতিক জালে আটকে গেছে। ক্রমান্বয়ে এটি সমাজে একটি অপরিহার্য ব্যবস্থা হিসাবে গৃহীত হয়েছে। এই বিদেশী 'সাহায্যে'র প্রবাহ শুধু যে আমদানি বাণিজ্যকে শক্তিশালী করেছে তাই নয়, বাংলাদেশের উন্নয়ন গতিধারা গঠন ও দেশের ভেতর একটি অনুৎপাদক শাসক শ্রেণী এবং সমাজে ভিখিরী সংস্কৃতির বিস্তারেও মূল প্রভাবকের ভূমিকা পালন করেছে।

১৯৭২-৭৩ সালে বাংলাদেশে বিদেশী সাহায্যের মধ্যে প্রকল্প 'সাহায্য' ছিল শতকরা ১৪.৫ ভাগ, ক্রমেই তার অনুপাত বেড়েছে; ১৯৭৪-৭৫ এর শতকরা ১৫.৮৭ ভাগ বেড়ে ১৯৮৫-৮৬ তে দাঁড়ায় ৫৪.৪১ ভাগ এবং ১৯৯৩-৯৪ তে পৌঁছায় ৬৩.৬ ভাগে। ১৯৯৭ সালে এটি উঠেছে শতকরা ৭৫ ভাগে। ১৯৭২-৭৩ সালে বিদেশী 'সাহায্যের' পরিমাণ ছিল ২৭ কোটি ডলার, ১৯৯৫-৯৬ সালে তা উঠেছে ১৫৮ কোটি ডলারে। গত ২৫ বছরে এদেশে প্রবাহিত (অবমুক্ত) বিদেশী সাহায্যের পরিমাণ ৩০৬৩ কোটি ডলার বা প্রায় ১,২৩,১২৩ কোটি টাকা যা বর্তমানে এক বছরের জাতীয় আয়ের প্রায় সমান।

বাংলাদেশে বিদেশী সাহায্যের সুফলভোগীদের চিহ্নিত করতে গিয়ে এক গবেষণায় দেখে গেছে যে, বিদেশী 'সাহায্য' যা আসে তার শতকরা ৮০ ভাগ বিদেশ থেকে দ্রব্য আমদানি এবং তাদের কনসালট্যান্টদের পেছনেই ব্যয় হয়; বাকী ২০ ভাগের ১৫ ভাগ স্থানীয় আমদানিকারক, ইন্ডেন্টর আর এর সঙ্গে সম্পর্কিত সামরিক-বেসামরিক আমলাদের জন্য ব্যয় হয় (সোবহান, ১৯৯২)। এই প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে বিদেশী তহবিল বৃদ্ধির সঙ্গে দেশে বহুসংখ্যক অনুৎপাদক-কোটিপতি সৃষ্টির সম্পর্ক বুঝতে অসুবিধা হয় না। একটা সহজ হিসাব এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। এ পর্যন্ত এদেশে বিদেশী 'সাহায্য' এসেছে প্রায় ১,২৩,১২৩ কোটি টাকা। এই টাকা মূখ্যত আমদানি বাবদই ব্যয় হয়েছে। আমদানি কমিশন ২ শতাংশ ধরলে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪৬২ কোটি টাকা। কোন কোন ক্ষেত্রে এই কমিশন আরও বেশি এবং এগুলো ভাগ হয় সামরিক-বেসামরিক আমলা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে। আর এই পুরো সাহায্য সাম্রাজ্যের অন্যতম সুফলভোগী বিশেষজ্ঞরাও, যাঁরা মেধার দিক থেকে অনেক উচ্চতর অবস্থানে থেকেও অনেক নিম্নস্তরের সাহায্য-ডিলারের কনিষ্ঠ অংশীদার হিসেবে ঠিকাদারী গবেষণা করেন।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাত

স্বাধীনতার পর এত বছরেও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার ভৌত অবকাঠামো দাঁড়ায়নি। গত কয়েক বছর থেকে রেডিও-টিভিতে শিশুদের স্কুলে যাবার জন্য ডাক দেয়া হলেও তাদের পড়ানোর মতো স্কুল-বেঞ্চ-শিক্ষক-বইপত্রের ব্যবস্থা হয়নি। একই পদ্ধতির শিক্ষার পরিবর্তে সমাজে শ্রেণী ও সামাজিক শক্তির মেরুকরণের সংগে সঙ্গতিপূর্ণভাবে বহু পদ্ধতির বিকাশ হয়েছে, স্বচ্ছল পরিবারের জন্য বেসরকারী ব্যয় বহুল শিক্ষা, মধ্য ও নিম্নবিত্তের জন্য সরকারী শিক্ষা এবং দরিদ্রদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষা। এই ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে শিক্ষার মান, কর্মবাজারে সুযোগ ইত্যাদিতে ব্যবধান আকাশ পাতাল। স্বাধীনতার পর থেকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সরকারী ব্যয়র পরিমাণগত অনুপাত কিংবা গুণগত বিকাশ কোনটিই ঘটেনি। ১৯৭২ সালে শিক্ষাখাতে ব্যয় ছিল রাজস্ব ব্যয়ের ২১.১৪%, এই অনুপাতে ব্যয় এখনও ফিরে আসেনি। ১৯৭৩ সালে থেকে এটা কমতে থাকে এবং সামরিক খাতের ৯.৪৬% ব্যয় ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। এখন দুটো প্রায় সমান সমান। প্রকৃত ব্যয় হিসাব করলে শিক্ষাখাতে ব্যয় আরও কমেছে। স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়ের ক্ষেত্রেও কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি।

সারণী ৭। রাজস্ব ব্যয়ে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাত

বছর	মোট রাজস্ব ব্যয়	শিক্ষাখাতে ব্যয়	%	প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়	%	স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতে ব্যয়	%
১৯৭২-৭৩	২১৩.১১	৪৫.০৬	২১.১৪	২০.১৬	৯.৪৬	১১.১৪	৫.২৩
১৯৭৩-৭৪	৩৪৬.২	৬৪.৮২	১৮.৭২	৪১.৯৬	১২.১২	১৪.৩৯	৪.১৬
১৯৭৬-৭৭	৬৭৯.৩১	৯৮.২১	১২.৭৬	১৫১.৩৯	১৯.৬৮	৩০.২৯	৩.৯৪
১৯৮১-৮২	১৮৪৯.৬৮	২৩১.৬৪	১২.৫২	৩৪৭..৫৬	১৮.৭৯	৮৭.২০	৪.৭১
১৯৮৮-৮৯	৬১৭০	৯৪৮	১৫.৩৬	১০১৫	১৬.৪৫	৩২১.১৩	৫.২০
১৯৯০-৯১	৭৩১০	১১৮২	১৬.১৭	১১৮০	১৬.১৪	৩৮৬.৯	৫.০
১৯৯১-৯২	৭৯০০	১৩৮২	১৭.৪৯	১৩০১	১৬.৪৭	৪৩১	৫.০
১৯৯৪-৯৫	১০৩০০	২০০৮	১৯.৪৯	১৮৮৭	১৮.৩২	৬৮৫	৬.৬৫
১৯৯৫-৯৬	১১৮১৪	২১৪৮	১৮.১৮	২০৬৯	১৭.৫১	৭৩০	৬.১৮
১৯৯৬-৯৭	১২১০৩	২২৩৩.২৮	১৮.৪৫	২২১৫.৮৮	১৮.৩১	৭৪৮.৪৮	৬.১৮

সূত্রঃ বিবিএস, ১৯৮৬,১৯৯২,১৯৯৬ ; বাজেট বক্তৃতা,১৯৯৬।

শিক্ষাখাত বলে যে খাতটির কথা উল্লেখ করা হচ্ছে সেটি বস্তুতঃ শিক্ষা ও ধর্ম খাত। তারপরও এই যুক্ত খাতে ব্যয় বরাদ্দ সামরিক খাতের তুলনায় বেড়েছে অনেক কম। এই খাতে ৯৫-৯৬ সালে বরাদ্দ ছিল ২১৪৮.০৩ কোটি টাকা, ৯৬-৯৭ সালে এক্ষেত্রে বাড়ানো হয়েছে ৮৫.২৫ কোটি টাকা, দাঁড়িয়েছে ২২৩৩.২৮ কোটি টাকায়। বৃদ্ধির হার ৪.১১%। মুদ্রাস্ফীতি বিবেচনা করলে প্রকৃত বরাদ্দ কমেছে। অন্যদিকে ৯৬-৯৭ সালের বাজেটেও সামরিক খাতে বরাদ্দ সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি, যদিও এবার এখাতেই রাজস্ব বাজেটে ব্যয় সবচাইতে বেশি বাড়ানো হয়েছে। আগের বছর মূল বাজেটে এখাতে ব্যয় ছিল ১৯৩৪.৬৭ কোটি টাকা, পরের বছর তা ২৮১.২১ কোটি টাকা বড়িয়ে করা হয়েছে ২২১৫.৮৮ কোটি টাকা। বৃদ্ধির হার ১৪.৫৩%।

সারণী ৮। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধিঃ ১৯৭২-৯৫

স্তর	১৯৭২	১৯৮০	১৯৯০	১৯৯৫	মোট বৃদ্ধির হার % (৭২-৯৫)
প্রাথমিক (সরকারী ও বেসরকারী)	৩৬,৫৪৭	৪৩,৯৩৬	৪৫,৯৩৬	৬০,২৯২	৬৫%
মাধ্যমিক	৭,৭১৭	৮,৪৮৫	১০,৪৪৮	১১,৭৫৯	৫২%
দাখিল	৫২৮	১,৪০২	৪,৩০৬	৪,০৫২	৬৬৭%
সাধারণ কলেজ	৫৩১	৫৮১	৮৪৮	১,১২৫	১১২%
বিশ্ববিদ্যালয়	৬	৬	৮	১৮	২০০%

সূত্র ঃ BANBEIS ও বিবিএস-এর বিভিন্ন বছর। উদ্ধৃতিঃ আব্দুল্লাহ আল-মুতীঃ আমাদের শিক্ষা কোন পথে, ঢাকা, ১৯৯৬।

১৯৯৫ সালের প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নিয়ে সরকারী দলিলপত্রে বেশ স্ববিরোধিতা আছে। যেমন অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ১৯৯৬-এ বলা হয়েছে এই সময়ে উপরের সারণীর সংখ্যাই, ৬০,০০০। কিন্তু বিবিএস-এর স্ট্যাটিস্টিক্যাল পকেট বুক, ১৯৯৫-এ ১৯৯৪ এর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দেখানো হয়েছে প্রায় ৯৬,০০০। তবে সব হিসাব থেকেই দেখা যাচ্ছে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বৃদ্ধি বেসরকারী খাতেই ঘটেছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী ১৯৯০ সালে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩৮,০০০; ১৯৯৫ সালেও এই সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে। অন্যদিকে, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৯৯০ সালে ছিল ৯ হাজার, ১৯৯৫ সালে এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২২ হাজার। এর মধ্যে ব্যবসায়ী ও এনজিও উভয় উদ্যোগই অন্তর্ভুক্ত।

সারণী ৯। শিক্ষার নানা স্তরে শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি, ১৯৭২-৯৫

(শিক্ষার্থী সংখ্যা, লক্ষ)

শিক্ষার স্তর	বছর				গড় বার্ষিক বৃদ্ধি	মোট কতগুণ বৃদ্ধি (৭২-৯৫)
	১৯৭২	১৯৮০	১৯৯০	১৯৯৫		
প্রাথমিক	৭৭.৯৪	৮২.১৯	১১৯.৪০	১৫৩.৯২	৩.০০	১.৯৭
মাধ্যমিক	১৮.৩৪	২১.৪২	২৯.৯৪	৪৭.৮৪	৪.২৬	২.৬১
দাখিল মাদ্রাসা	০.৯৫	১.২৪	৬.১৫	১১.৫২	১১.৪৬	১২.১৩
সাধারণ কলেজ	৩.৮৫	৩.৩৪	৮.২৪	১২.০৮	৫.১০	৩.১৪
বিশ্ববিদ্যালয়	০.২৬	০.৩৭	০.৫২	০.৭৬	৪.৭৭	২.৯২

সূত্র ঃ BANBEIS ও বিবিএস-এর বিভিন্ন বছর। উদ্ধৃতিঃ আব্দুল্লাহ আল-মুতীঃ আমাদের শিক্ষা কোন পথে, ঢাকা,১৯৯৬।

শিক্ষাখাতে ব্যয়ের গুণগত দিকের ফলাফল হলো স্কুলের চাইতে মাদ্রাসার বিপুল সংখ্যা বৃদ্ধি এবং মাদ্রাসায় মাথাপিছু ছাত্রের পেছনে স্কুলের তুলনায় অধিক ব্যয়।

সারণী ১০। শিক্ষাখাতে মাথাপিছু সরকারী ব্যয়

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	ছাত্রছাত্রী মাথাপিছু ব্যয় (টাকা)
সরকারী মাধ্যমিক স্কুল	২৯৯৭
বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল	৮৪৩
সরকারী কলেজ	২৭৪৪
বেসরকারী কলেজ	১৪৩৫
সরকারী মাদ্রাসা	৪৯৮৫
বেসরকারী মাদ্রাসা	১০৬২
বিশ্ববিদ্যালয়	২৪,৬০২

সূত্রঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা,১৯৯৬

স্বাস্থ্যখাতটিও একটি যুক্তখাত। এর মধ্যে 'পরিবার পরিকল্পনা' (বর্তমানে পরিবার কল্যাণ কথিত) বিষয় ব্যয়ও ধরা হয়- এই অংশটিতে যেহেতু তথাকথিত বিদেশী সাহায্য বেশি আসে সেহেতু এই বরাদ্দই এই যুক্তখাতের চেহারা গঠন করে যার মধ্যে বরাবরই খুব শীর্ণ অবস্থায় থাকে সাধারণ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ব্যয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে একটি বছরের (১৯৯৬-৯৭) বাজেটের কথা বলা যায়। যেসব

খাতে ১৯৯৬-৯৭ সালের সংশোধিত বাজেটে উন্নয়ন বরাদ্দ কমেছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ কৃষি, পল্লী উন্নয়ন, বন্যা ও পানি, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি গবেষণা, যুক্তভাবে শিক্ষা ও ধর্ম এবং স্বাস্থ্য, শ্রম ও জনশক্তি। সবচাইতে বেশি হারে কমেছে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি গবেষণা, ৬১ কোটি টাকা থেকে ২৭.৫০ কোটি টাকা-হ্রাসের হার ৫৪.৯২%, এরপরই হলো শিক্ষা ১৬০৫.২৯ কোটি টাকা থেকে ১৪০২.৪৩ কোটি টাকা, কমেছে ২০২.৮৬ কোটি টাকা-হ্রাসের হার ১২.৬৩%। নতুন উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দের অনুপাতে তেমন কোন পরিবর্তন আসেনি। ১২,৫০০ কোটি টাকার উন্নয়ন বাজেটে (১৯৯৭-৯৮) বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি গবেষণা বাবদ ধরা হয়েছে মাত্র ৬০ কোটি টাকা। এখাতে এই তুচ্ছ ব্যয়বরাদ্দ এবং তারও আবার ৫০ শতাংশেরও বেশি বছর শেষে কেটে নেয়া খুব তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৯৮-৯৯ পর্যন্তও এই ধরনের কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি।

দারিদ্র ও দারিদ্র বিমোচন

বাংলাদেশে ৬০ দশকের কুমিল্লা মডেল ইত্যাদির ধারাবাহিকতায় ৭০ দশকের মাঝামাঝি থেকে দারিদ্র-বিমোচন কর্মসূচী অনেক জোরদার হয়েছে। এ সম্পর্কিত সরকারী সংস্থাগুলোর রিপোর্ট দেখলে যে কেউ সঙ্গত কারণেই ভাবতে পারেন যে, অগ্রগতি খুবই বিশাল। কিন্তু খটকা লাগার জন্য গ্রামে গ্রামে ঘোরার দরকার হয়না; ঢাকা শহরে একটু বেরুলেই যে কোন স্বাভাবিক মানুষের মাথায় প্রশ্ন আসবে যে, ৩৫ বছর ধরে দারিদ্র বিমোচনের পর এবং গ্রামাঞ্চল জুড়ে হাজার হাজার সংস্থার এত 'সাফল্যের' পরও ঢাকা শহরে মানুষের এই প্রবাহ কেন? ঢাকার ফুটপাতেই লক্ষ মানুষ যদি থাকে দারিদ্র তাহলে কি বিমোচন হচ্ছে হাজার কোটি টাকা খরচ করে? বাংলাদেশে এত গবেষণা হচ্ছে তারপরও তথ্যভিত্তি বলতে যা বোঝায় তার কোন ভাল অবস্থা এখানে তৈরী হয়নি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সংগৃহীত তথ্যই আমাদের প্রধান অবলম্বন। এই ব্যুরো থেকে বিভিন্ন বছরে পারিবারিক ব্যয় সংক্রান্ত যে জরীপ করা হয় সেটা থেকেই দারিদ্র সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তবে এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে এই যে, একই তথ্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন ফলাফল নিয়ে আসে। দারিদ্র রেখা নির্ধারণ, দারিদ্রের সংজ্ঞা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও একই কারণে বিস্তর তফাৎ দেখা যায়।

ক্যালরী পদ্ধতিতে হিসাব করলে ১৯৮৩-৮৪ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র সীমার নীচে মোট জনসংখ্যা ছিল ৫কোটি ৮৩ লাখ, ৮ বছরের বিমোচন কর্মসূচীর পর তা কমে হয়েছে ৫ কোটি ১৬ লাখ, এই হিসেবে ৮ বছরে কমেছে প্রায় ৭০ লাখ, বছরে ৯ লাখের মত (বিবিএস, Household Expenditure Survey 1990-91)। কিন্তু এই পদ্ধতি অনেকেই গ্রহণযোগ্য মনে করেননি। বিশ্বব্যাংকের

দফতরে সেন ও রেভেলিয়েন এ সংক্রান্ত গবেষণায় অন্য এক পদ্ধতিতে হিসাব করে দেখেছেন ৮ বছরে কমে আসা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ১৫ লাখের বেশি নয়, সেই হিসেবে বছরে কমেছে মাত্র ২ লাখ। অথ্য অনুযায়ী, ১৯৮৩-৮৪ সালে গ্রামীণ জনসংখ্যার শতকরা মোট ৫৩.০ ভাগ দারিদ্র সীমার নীচে ছিল, ৮ বছর অনেক প্রতিষ্ঠানিক ঋণ কর্মসূচী ও দারিদ্র বিমোচনের অনেক 'আন্তরিক প্রয়াসের' পর তা কমে হয়েছে শতকরা ৫২.৯ ভাগ।

বিভিন্ন পদ্ধতিতে দারিদ্র পরিস্থিতির যে হিসাব পাওয়া যায় সেগুলো নিয়ে একটি সারসংক্ষেপ ও উন্নয়ন মাত্রার হিসাব দেখানো হয়েছে পরের সারণীতে। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ক্যালোরী পদ্ধতিতে হিসাব করলে বর্তমান ব্যবস্থা চলতে থাকলে দারিদ্র বিমোচনে সময় লাগবে প্রায় ৭০ বছর। উন্নততর পদ্ধতিতে হিসাব করলে এই কাজে লাগবে ৩১৩ বছর; একই পদ্ধতিতে গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচনে সময় লাগবে ৯০৯ বছরেরও বেশী, অর্থাৎ প্রায় ১০০০ বছরের কর্মসূচী!!

১৯৯৫-৯৬ সালের যে পারিবারিক ব্যয় জরীপ প্রকাশিত হয়েছে তাতে উপরের প্রবণতার কোন পরিবর্তন হয়নি। বরঞ্চ জরীপের ফলাফল পরিস্থিতির অবনতিই নির্দেশ করে। ৯০ দশকের প্রথমার্ধে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৪ ভাগের বেশি। দ্বিতীয়ার্ধে এটি ৫ ভাগেরও বেশী। যেসময় জিডিপি রয়েছে শতকরা ৩৫ ভাগ, সেসময়ে দারিদ্র কমেছে শতকরা ২ ভাগের কম।

সারণী ১১। ' দারিদ্র' উন্নয়নের মাত্রা

বিষয়	মৌলিক চাহিদা পদ্ধতি	ক্যালোরী গ্রহণ পদ্ধতি
বছরে 'দারিদ্ররেখার' উপরে উঠা মানুষের শতকরা হার		
গ্রাম	০.১১%	১.৫৩%
শহর	০.৯১%	০.৮২%
জাতীয়	০.৩২%	১.৪৪%
এই হিসাবে দারিদ্র বিমোচনের জন্য কত বছর প্রয়োজন ।		
গ্রাম	৯০৯.০৯	৬৫.৩৬
শহর	১০৯.৮৯	১২১.৯৫
জাতীয়	৩১২.৫	৬৯.৪৪

দারিদ্র বিমোচনে নিয়োজিত সংস্থাসমূহের কথাবার্তা থেকে এটা মনে হতে পারে যে, বাংলাদেশের মানুষ নিজেরা উদ্যোগহীন এবং সমাজের মধ্যে কর্মসংস্থান

সৃষ্টির আর কোন প্রক্রিয়া জারী নেই। হাজার হাজার বছর ধরে যে মানুষেরা প্রকৃতির সঙ্গে বৈরী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছেন তাঁরা এনজিওর কথা শুনে বা কিছু ঋণ পেয়ে তারপর নানা কাজ কর্মে হাত দিয়েছেন এটাও ইতিহাস ও জনগণের বাস্তব জীবনে অব্যাহত প্রচেষ্টাকে অস্বীকার করবারই শামিল। সরকারের তথ্য থেকেই দেখা যাচ্ছে, গ্রাম ও থানা পর্যায়ে গত ১০ বছরে বহু ধরনের অকৃষি অর্থনৈতিক তৎপরতা বিকশিত হয়েছে যার অনেকগুলোই সরকার বা এনজিও কোন দিক থেকেই অর্থ সাহায্যের উপর নির্ভরশীল নয়। ঢাকা শহরে রিক্সাসহ পরিবহনের বিভিন্ন খাতে ২০ লক্ষ মানুষ জড়িত হয়েছেন গত ১০ বছরে। গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন ছোট বড় শিল্প খাতে জড়িত হয়েছেন প্রায় ১৪ লক্ষ। তারপরও দারিদ্র বিমোচনের "সাফল্যের" সংখ্যা হলো ১৫ লাখের।

দারিদ্র বিমোচনের নামে বরাবর যে বরাদ্দ থাকে তার বৃহৎ অংশ আমলা-দেশী বিদেশী গবেষক-এনজিও কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন দারিদ্র ব্যবসায়ীদের স্ফীত হবার কাজেই লাগে বেশি। এবং দারিদ্র টিকিয়ে রাখা ও সৃষ্টির যাবতীয় ব্যবস্থাবলীর পেছনে এর চাইতে অনেক বেশী বরাদ্দ থাকে। সেই প্রক্রিয়ার জোরও তুলনায় অনেক বেশি। ফলে সঙ্গত কারণেই দারিদ্র বিমোচনের নামে বিভিন্ন বরাদ্দ অনেক মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করলেও দারিদ্র নিরসন তো দূরের কথা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় তা হ্রাসও করতে সক্ষম হয়না। সরকারী দলিলপত্র থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। সে কারণেই স্বাধীনতা লাভের সময় বাংলাদেশের যে জনসংখ্যা ছিল প্রায় সে সংখ্যক মানুষই এখন দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করেন। উপরন্তু বহুবিধ দারিদ্র বিমোচনের ঢাকঢোল সত্ত্বেও শহরগুলোতে বিশেষতঃ ঢাকা শহরে ক্রমবর্ধমান হারে শ্রমজীবী মানুষের আগমনও এসব কর্মসূচীর অন্তর্নিহিত সারহীনতারই বহিঃপ্রকাশ। এটা খেয়াল করবার বিষয় যে, বস্তুতঃ যে সব দেশে, পুঁজিবাদী বা বিল্পবউত্তর সমাজে, দারিদ্র নিরসন বা হ্রাস উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ঘটেছে তার কোথাও তা তথাকথিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী দিয়ে ঘটেনি, ঘটেছে সামগ্রীক উৎপাদন ব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তনের মাধ্যমে।

কালো অর্থনীতি

বাংলাদেশে একক শক্তিশালী খাত হিসেবে যেটিকে এখন অভিহিত করা চলে সেটিকে আবার বিভিন্ন উপভাগে বিভক্ত করা যায়, এগুলো হলঃ গোপন, কালো, মাস্তান অর্থনীতি। পরোক্ষ প্রভাব থাকলেও জিডিপিতে এর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি

হিসাবের ব্যবস্থা নেই। এই অর্থনীতির সীমা এবং তার সরল ও যৌগিক, সাময়িক ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণা এখনও হয়নি। তবে এটি আন্দাজ করা যায় যে, দেশের বিনিয়োগ, আয়-উপার্জন, কর্মসংস্থান ইত্যাদিতে এই খাতের একটি বড় ভূমিকা আছে। দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি অনেক সিদ্ধান্তের পেছনেও এই খাতের ক্রিয়াশীল অর্থ ও লোকবলের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। অস্ত্র, মাদকদ্রব্য এই খাতের অন্যতম অংশ। স্বাধীনতার পর দেশে অর্থনৈতিক তৎপরতার যে ধরন সবচাইতে বেশি শক্তিশালী হয়েছে তা আইনী নেটওয়ার্ক বহির্ভূত এই অর্থনীতিকেই পুষ্ট করেছে বেশি। সাহায্য নির্ভর আমদানী-রপ্তানি, তথাকথিত সিস্টেম লস, ঘুষ, ব্যাংক ঋণ আত্মসাৎ, কর ফাঁকি, বেআইনী ব্যবসা ইত্যাদি এই অর্থনীতির জীবনীশক্তি। এই অর্থনীতিতে বিনিয়োগ, মুনাফা ইত্যাদি কোন কিছুই সরকারী হিসাবের মধ্যে নেই। কিন্তু এই অর্থনীতিতে নিয়োজিত আছেন বিপুল সংখ্যক মানুষ। এরকম ধারণারও যথেষ্ট যুক্তি আছে যে, দেশে গত প্রায় ৩ দশকে যে বিপুল বিত্তের অধিকারী একটি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে তাদের সম্পদের দ্রুত বৃদ্ধির পেছনে এই অর্থনীতির একটি বড় ভূমিকা আছে।

ঢাকা শহরে কেন্দ্রীভূত এই সম্প্রদায়ের উপর পরিচালিত একটি গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এই সম্পদায়ের বিত্ত গঠনে উল্লেখযোগ্য পথগুলো হচ্ছে, "(ক) সরকারী ক্ষমতা কব্জা করে পরিত্যক্ত বা সাধারণ সম্প্রত্তি দখল, সরকারী সম্পদ হস্তগত করা, চুরি, জালিয়াতি; (খ) চোরাচালানী, মাদকদ্রব্য ব্যবসা, মজুদদারী, কালোবাজারী, মুদ্রা ব্যবসা, হুন্ডি, আন্ডার ও ওভার ইনভয়েসিং (গ) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও অর্থসংস্থানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে বিপুল অংকের ঋণ নিয়ে তা মেরে দেয়া বা আমদানী-কমিশন; (ঘ) সরকারী বিধিনিষেধ, নিয়ন্ত্রণ, কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি, পারমিট ক্রয় বিক্রয় ইত্যাদি" (সিদ্দিকী প্রমুখ ১৯৯০ঃ ১৯২)। একটি খসড়া ও অসম্পূর্ণ হিসাবে আসাদুজ্জামান দেখিয়েছেন যে, বাংলাদেশে জিডিপির শতকরা প্রায় ২০ ভাগের সমান সম্পদের কোন খবর নেই (আসাদুজ্জামান, ১৯৯৫)। ১৯৭২-৭৩ এ এরকম অর্থের পরিমাণ ছিল ১০১৩.৮২ কোটি টাকা, ১৯৯৫-৯৬ সালে একই হার ধরলে এ অংক প্রায় ২৭ হাজার কোটি টাকা। কোন কোন ভাষ্য অনুযায়ী দেশে কালো টাকার পরিমাণ ৩০ হাজার কোটি টাকারও বেশি।

নারী

অর্থনৈতিক কাজে অংশগ্রহণ পরিবারের সদস্যদের খোরপোষের চিন্তা করা ও ঘাটতি পূরণের জন্য নিজের শ্রমশক্তি কাজে লাগানো ইত্যাদি এদেশে অনেক কাল থেকেই চলে আসছে। বস্তুতঃ এ দেশের অর্থনীতির হিসাব নিকাশে সাধারণতঃ দৃশ্যমান সরাসরি উপার্জনমূলক কাজ, সে হিসেবে শুধু পুরুষের শ্রমই, বিবেচনা করা হয়েছে। এই হিসাবে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিবারের আয় এতই কম যে, তাদের নিছক দৈহিকভাবে টিকে থাকারও ব্যাখ্যা করা কঠিন। এত কম আয় নিয়েও তারা কিভাবে টিকে আছেন সে রহস্যের কিনারা পাওয়া যায় এসব পরিবারের মেয়েদের কাজ বিবেচনা করলে। গ্রামের মেয়েরা সাধারণতঃ দুধরনের কাজ করেন-একটি হচ্ছে ব্যয় হ্রাসকরণের কাজ, অন্যটি হচ্ছে সরাসরি উপার্জনমূলক কাজ (যেমন- ঘরের পাশে সবজী চাষ, ধান, হাঁস-মুরগী-গরু-ছাগল পালন, কাঁথাসহ বিভিন্ন সেলাই, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, ঘরের বিভিন্ন কাজ, স্বল্প সঞ্চয় ইত্যাদি)।

শ্রমশক্তির পুরানো সংজ্ঞা অনুযায়ী এতে নারীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৩০ লক্ষ, এখন সংজ্ঞা কিছুটা বাস্তবমুখী করায় শ্রমশক্তিতে নারীর সংখ্যা ২ কোটি ছাড়িয়ে গেছে (বিবিএস, ১৯৯৫)। নারীর গার্হস্থ্যকাজকে হিসাবে নিলে এই সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে এবং সন্দেহ নেই তা পুরুষের সংখ্যা ছাড়িয়ে যাবে। হিসাবের এই পুনর্বিন্যাস জিডিপির ক্ষেত্রেও দরকার যেখানে নারীর শ্রম হয় অনুল্লেখ্য থাকে নয়তো অন্য কিছুর আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। শামীম হামিদ এবিষয়টি অনুসন্ধান করে জানিয়েছেন, প্রচলিত পদ্ধতির হিসাবে মোট জিডিপির মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগ পুরুষের শ্রম এবং শতকরা ২৫ ভাগ নারীর শ্রম। কিন্তু বাজার-বহির্ভূত কাজকে হিসাবের মধ্যে নিলে নারীর অবদান দাঁড়ায় শতকরা ৪১ ভাগ এবং পুরুষের অবদান শতকরা ৫৯ ভাগ। এবং বাজার বহির্ভূত কাজ হিসাবের মধ্যে নিলে জিডিপি বৃদ্ধি পায় শতকরা প্রায় ২৯ ভাগ (হামিদ, ১৯৯৪)।

স্বাধীনতার পর এক পুরুষের আয় নির্ভর পরিবার টিকে থাকার বাস্তবতা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। বিভিন্ন পেশায় প্রকৃত আয় হ্রাস পেয়েছে। এর ফলে মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত দুক্ষেত্রেই ঘরের বাইরে এসে নারীর উপার্জনের সামাজিক তাগিদ বেড়েছে। একই সময়ে নারীর অর্থনৈতিক কাজে অংশগ্রহণের সপক্ষে আন্তর্জাতিক জনমতও সংগঠিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের প্রভাবে ১৯৭৫-৮৫ সময়কালে যে নারী দশক হয় তার প্রভাবে বিদেশী তহবিল

যোগানের প্রবাহে নারী প্রশ্ন অনেক স্পষ্টভাবে যুক্ত হয়। আন্তর্জাতিক পুঁজি বিনিয়োগকারীরাও বিভিন্ন কারণে নারীশ্রমের ব্যাপারে আগ্রহী হয়।

বাংলাদেশে ৭০ দশকের শেষ থেকে রপ্তানিমুখী খাতের যে প্রসার ঘটে সেখানেও নারী শ্রমিকের চাহিদা সৃষ্টি হয়। এই সব কিছুর প্রভাবে গত দুদশকে অর্থনৈতিক কাজে নারীর দৃশ্যমান অংশগ্রহণ অনেক বেড়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো গার্মেন্টস শিল্প। এই শিল্পের শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি, এখন প্রায় ১৫ লক্ষ, নারী। এ ছাড়া প্লাস্টিক, বিড়িসহ অন্যান্য শিল্পেও নারীর অংশগ্রহণ বেশি। মাটিকাটা, ইটভাঙ্গা, খাবার দোকান ইত্যাদিতেও নারীর অংশগ্রহণ অনেক বেড়েছে। অন্যান্য পুরানো পেশা যেমন গৃহ-শ্রমিক ইত্যাদি অব্যাহত আছে, তবে নগরায়নের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এগুলোর সংখ্যা বেড়েছে। গ্রামাঞ্চলে সরকার ও এনজিওসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর বিস্তারের ফলে নারীর প্রথাগত কাজগুলোতে আরও সংগঠিতভাবে অংশ নেবার সুযোগ বেড়েছে। ক্ষুদ্র ব্যবসাতেও তাঁদের অংশগ্রহণ দেখা যায়।

মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরাও এখন আগের তুলনায় বাইরের কাজে বেশি অংশগ্রহণ করছে। এদের অংশগ্রহণের পেছনে দুটো কারণ-এক, পরিবারের এক পুরুষের আয়ের ঘাটতি পূরণ করা এবং দুই, নিজেদের পরিচয়, ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন বোধের বিকাশ। উদ্যোগ হিসেবেও উচ্চবিত্ত, নিম্নবিত্ত দুক্ষেত্রেই মেয়েদের অধিক অংশগ্রহণ দেখা যাচ্ছে। সমাজে পুরুষতান্ত্রিক আইনকাঠামো, ধর্মীয়-সামাজিক-পারিবারিক বিধিনিষেধ ইত্যাদির সঙ্গে নারীর মুখোমুখী হবার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে অনেক বেশি। অন্যদিকে বিদ্যমান পুরুষতান্ত্রিকতা অনেক কম দামে নারীর শ্রমশক্তি কিনে নিতে, তার প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ভেঙ্গে দিতে বা দুর্বল করতে মালিকদের অনেক শক্তি যোগাচ্ছে।

দুই। অর্থনীতির পরিচালকেরা

রাষ্ট্র ও সরকারঃ সংবিধান, পরিকল্পনা

ক) সরকারের বিভিন্ন ধরন

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের গত প্রায় তিন দশকে বহুরকম শাসনব্যবস্থা ও সরকার কাজ করেছে। এর মধ্যে আছে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ক্ষমাতাসীন বিপুল জনপ্রিয় সরকার (১৯৭১-৭৪), বেসামরিক একদলীয় শাসন (১৯৭৫), সামরিক শাসন (১৯৭৫-৮২), সামরিক কর্তৃত্বে নির্বাচিত সরকার (১৯৭৮, ১৯৮৬), ভোটারবিহীন নির্বাচনে নির্বাচিত সরকার (১৯৮৮, ১৯৯৬), দীর্ঘ আন্দোলনের মাথায়

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচিত সরকার (১৯৯১, ১৯৯৬---)। শাসন পদ্ধতি ও সরকারের ক্ষেত্রে এসব ঘটনাবলী সত্ত্বেও সুস্পষ্ট একটা ধারাবাহিকতা দেখা যায় অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রে। আরেকটি ধারাবাহিকতা দেখা যায় সংবিধানে বর্ণিত জনগণের অর্থনৈতিক অধিকারের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনে।

খ) সাংবিধানিক অঙ্গীকার

বাংলাদেশের অর্থনীতি পর্যালোচনায় সংবিধানের প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলো বিবেচনা করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এগুলো থেকে রাষ্ট্রের ঘোষণা ও কার্যক্রমের সম্পর্ক ও দূরত্ব বোঝা যাবে।

* প্রস্তাবনা- "সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে"।

* অনুচ্ছেদঃ ১৫- "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়ঃ

ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা।

খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসংগত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার।

গ) যুক্তিসংগত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার। এবং

ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার---"

* অনুচ্ছেদঃ ১৭-- "রাষ্ট্র একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য --- নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"

* অনুচ্ছেদঃ ১৯। ২- "মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"

* অনুচ্ছেদঃ ২০। ২-" রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না।"

* অনুচ্ছেদঃ ২৮ - "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।"

* অনচ্ছেদঃ৭। ২ - "জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।"

বাংলাদেশে ধর্ম, শ্রেণী ও লিঙ্গ বৈষম্য আকস্মিক বা আইন বহির্ভূত ঘটনা নয়, এসব বৈষম্যের আইনগত ভিত্তিও খুব শক্তিশালী, পুরানো। মাত্র কয়েকটি আইনের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়ঃ অর্পিত সম্পত্তি আইন, সংবিধানের সাম্প্রদায়িকীকরণ ও রাষ্টধর্ম বিল সরাসরি ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করেছে। কিন্তু এসব আইন অসামঞ্জস্য হবার কারণে বাতিল হয়নি। পারিবারিক আইন, বিবাহ বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, সন্তানের উপর কর্তৃত্ব সরাসরি নারী-অধস্তনতাকে বৈধতা দান করে। সুতরাং এগুলো সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদের বিরোধী এবং ৭।২ অনুচ্ছেদ বলে এগুলো বাতিল হবার কথা। একই অনুচ্ছেদবলে বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থাও বাতিল হবার কথা। বাতিল হবার কথা কালো টাকা বানানোর ও উৎপাদনশীল খাতকে ধ্বংস করবার যাবতীয় নীতি-পদক্ষেপ। কিছুই হয়নি। বাংলাদেশের বস্তুগত অগ্রগতি ও জনগণের অবস্থানের বিষয় পর্যালোচনার সময় সংবিধানের এই অনুচ্ছেদ আমাদের মনে রাখা দরকার। এ থেকে অন্ততঃ একটি বিষয় আমাদের কাছে পরিস্কার হবে যে, সংবিধান নিজে নিজে কার্যকর হয় না, কার্যকর যারা করে তাদের অবস্থান ও ক্ষমতাই সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ কার্যকর হবে আর কোন অনুচ্ছেদ অকার্যকর থাকবে তা নির্ধারণ করে।

গ) পরিকল্পনা

বাংলাদেশে পরিকল্পিত উন্নয়ন একটি সাংবিধানিক অঙ্গীকার হলেও অর্থনৈতিক বিকাশে পরিকল্পনার ভূমিকা সব সময়ই থেকেছে প্রান্তিক। দেশে এ যাবত পাঁচটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে (১৯৭৩-৭৮, ১৯৮০-৮৫, ১৯৮৫-১৯৯০, ১৯৯০-৯৫, ১৯৯৭-২০০২)। এছাড়া প্রণীত হয়েছে একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮-৮০) ও একটি বার্ষিক পুনর্বাসন পরিকল্পনা (১৯৭২)। ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৭ দুবছর পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনার কাজ করা হয়। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অনেকদিকেই ধারাবাহিকতা আছে। তবে প্রথম পরিকল্পনার কিছু আলাদা বৈশিষ্ট

আছে যেগুলো স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের স্বাধীন অর্থনীতি বিকাশের উদ্দীপনা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসাবে বিবেচনা করা যায়। এটি প্রণয়নে মূল ভূমিকা পালন করেন দেশের তরুণ অর্থনীতিবিদরা যারা এ কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন কোন পেশাগত কারণে নয়, আদর্শিক কারণে ও সামাজিক দায়িত্বশীলতার অংশ হিসাবে। অন্যদিকে পরবর্তী পরিকল্পনাগুলো প্রণয়নে মূখ্য ভূমিকা ছিল আমলা বা 'দাতা' মনোনীত উপদেষ্টাদের। নুরুল ইসলাম প্রথমটি সম্পর্কে সঠিকভাবেই বলেছিলেন, "পেশাজীবি বিশেষজ্ঞ প্রভাবিত ও আমলাদের বদলে অর্থনীতিবিদদের দ্বারা পরিকল্পনা কমিশন পরিচালিত হবার ঘটানাই ছিল অতীতের ধারা ভেঙে অগ্রসর হবার একটি লক্ষণ" (ইসলাম ১৯৭৯ঃ৬)। সমাজে ও অর্থনীতিতে অতীতের ধারার পুনরাবৃত্তি না করা ও নতুন নির্মাণের চেষ্টা অনেক ক্ষেত্রেই হয়েছিল এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো পরিকল্পনা ক্ষেত্রেও তা টিকে থাকতে পারেনি।

অসঙ্গতি, দুর্বলতা সত্ত্বেও শুরুর যা কিছু উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা সেগুলোর কথা বাদ দিলে সবগুলো পরিকল্পনার মধ্যেই অনেক ক্ষেত্রে ঐক্য দেখা যায়। যেমন- (ক) কোন পরিকল্পনা নিয়েই জনগণকে সম্পৃক্ত করে কোন আলোচনা-পর্যালোচনা-বিতর্ক হয়নি এমনকি সংসদেও বিস্তারিত কোন আলোচনা হয়নি। (খ) সবগুলো পরিকল্পনাই শেষ হয়েছে অনেকগুলো অসমাপ্ত প্রকল্প নিয়ে। (গ) কোন পরিকল্পনাই সরকার গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেনি। (ঘ) সবগুলো পরিকল্পনাই কার্যতঃ বিদেশী 'সাহায্য' সম্পর্কিত প্রকল্পের সমষ্টি, যেগুলোর প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন দেশীয় পরিকল্পনা গ্রহণের উপর নির্ভরশীল নয়। পরিকল্পনার বাস্তব চেহারা বোঝার জন্য একজন প্রাক্তন আমলার একটি বাক্যই, বলা ভালো স্বীকারোক্তি, যথেষ্ট-"মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের পরিকল্পনার সেলগুলো খুবই দুর্বল। এগুলো কার্যতঃ দাতা সংস্থাগুলোর অঙ্গ হিসেবে কাজ করে' (টাস্কফোর্স-২ঃ২০০)*।

প্রথম পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিলঃ দারিদ্র ও বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং স্বনির্ভর উন্নয়ন। ৮ বছর এই লক্ষে কাজ করবার ফলাফল যা হয় তা বোঝা যায় দ্বিতীয় পরিকল্পনা দলিলের বক্তব্য থেকে। এখানে বলা হয়ঃ " দেশের শতকরা ৮৫ ভাগ মানুষ এখন দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করেছেন।" এখানেও অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে দারিদ্র বিমোচনকে ধরা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনা দলিলে বলা হয়ঃ "দেশে এ যাবতকালে পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্যই ছিল দারিদ্র বিমোচন, স্বাধীনতার পর অর্থনৈতিক ভাবে পশ্চাৎপদ অংশের জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের বরাবর চেষ্টা নেয়া হয়েছে।" কিন্তু একই দলিল

আবার এটাও বলে যে, "ক্রমবর্ধমানহারে গ্রামীণ জনগণ ন্যূনতম পুষ্টিসীমার নীচে পতিত হচ্ছেন। অব্যাহত দারিদ্রের সঙ্গে সঙ্গে বেকারত্ব অপুষ্টি, নিরক্ষরতা জটিল আকার ধারণ করছে।" এই কারণে দারিদ্র বিমোচনকে এখানেও মূল লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনা দলিলে কিছু নতুন বাক্যবিন্যাস দেখা যায়। বলা হয় 'নয়া' উন্নয়ন কর্মসূচী'র কথা, বলা হয় 'নতুন দর্শনের' কথা। এই দলিলে উন্নয়ন অভিজ্ঞতা পর্যালোচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ থাকলেও বাস্তবক্ষেত্রে এখানেও পুরনো কর্মসূচী ও ধাঁচেরই পুনরাবৃত্তি হয়। পঞ্চম দলিলে যোগ হয় আরও কিছু আশ্বাস।

বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংক

বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের ভূমিকা, প্রভাব, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির কোন বিশেষত্ব নেই। বিশ্বব্যাপী এই প্রতিষ্ঠান সামাজিক অর্থনৈতিক যে বিকাশের ধারায় পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার ব্যবস্থাপকের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হয়েছে তাতে তার ভূমিকার এই আন্তর্জাতিক মাত্রাটিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যে অর্থশাস্ত্র ও দর্শন বিশ্বব্যাংকের চালিকা শক্তি সেটিও এই বিকাশধারার সঙ্গে সম্পর্কিত। আইএমএফ এবং সদ্য গঠিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাকে নিয়ে বিশ্বব্যাংক এখন যে ত্রয়ী গঠন করেছে সেটিই কার্যত এখন বিশ্বে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। আন্তর্জাতিক পুঁজির কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপকের শক্তিবৃদ্ধি সুনিশ্চিতভাবেই সেই পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ ও শক্তি বৃদ্ধিরই বহিঃপ্রকাশ। বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ এখন কোন বহিঃস্থ শক্তি হিসাবে নয় বরং অন্তস্থ, শাসক শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ অংশেরই ভূমিকা।

১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার অন্যতম সহযোগী প্রতিষ্ঠান বিশ্বব্যাংকের ভূমিকা পাকিস্তানের পক্ষেই ছিল। এছাড়া ১৯৭১এর আগে পাকিস্তানের পরিকল্পনা-উন্নয়ন ইত্যাদিতেও বিশ্বব্যাংক ও যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় উপদেষ্টাদের ভূমিকা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। এসব কারণে স্বাধীনতার পরপর বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বব্যাংক দুটোরই গ্রহণযোগ্যতা ছিল অনেক কম। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সামাজিক আকাঙ্ক্ষার প্রভাবে এমনকি সরকারী পর্যায়ে একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক চেতনার যে উপস্থিতি অল্প সময়ের জন্য দেখা যায় সেখানে বিশ্বব্যাংক ছিল খলনায়কের অবস্থানে। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারীতে ঢাকায় বিশ্বব্যাংকের গভর্ণর রবার্ট ম্যাকনামারার সফরকালে তাঁর প্রতি সরকারের মনোভাব তার জন্য খুব সম্মানজনক ছিলনা।

কিন্তু অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হয়। বাংলাদেশের পরিকল্পনা কমিশনের প্রথম ডেপুটি চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম সে সময়কার অবস্থার সারসংক্ষেপ করেছেন

এভাবেঃ "বাংলাদেশের সামনে দুটো পথ খোলা ছিল- একটি হল কঠোর কৃচ্ছতাসাধনের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে অগ্রসর হওয়া যার জন্য দরকার ছিল আদর্শিক প্রেরণা, সেসময় এটা কোন সমস্যা ছিল না। দ্বিতীয় পথটি ছিল ধনী ও ক্ষমতাশালী দেশগুলো থেকে বিপুল পরিমাণ বিদেশী সাহায্য নেয়া যা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। বাংলাদেশ দ্বিতীয়টিই গ্রহণ করে" (ইসলাম, ১৯৭৯ঃ৮)। এর মধ্যে দিয়েই বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ নিজের জায়গা করে নেয়। ৭২ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর সদস্য হয়। তারপরের পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন সম্পর্কে সে সময়ের রাষ্ট্রীয় নীতির ঘনিষ্ঠ অংশীদার ও পরে পর্যবেক্ষক রেহমান সোবহান বলছেনঃ "এর পর থেকে পুরনো প্রকল্প পর্যালোচনা ও নতুন ঋণ কর্মসূচি পর্যালোচনার জন্য একের পর এক মিশন আসতে থাকে। বাংলাদেশ ততদিনে সাহায্যের নেশায় বুঁদ হয়ে গেছে" (সোবহান, ১৯৮২:১৭৩)। বিশ্বব্যাংক পাকিস্তানের মতোই বাংলাদেশের জন্য এইড ক্লাব গঠন করে যা তাদেরকে পুরোপুরি অর্থনীতির উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সাহায্য করে। মোটামুটি গুছিয়ে বসবার পরও বিশ্বব্যাংক তৎকালীন সরকারের "সমাজতান্ত্রিক" কথাবার্তার জোর কোন সমালোচনা করেনি বরঞ্চ ১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্পর্কে তারা প্রশংসাসূচক বক্তব্যই রেখেছে। একই সঙ্গে তারা গ্রামীণ উন্নয়ন ও সমবায়ের জন্য কুমিল্লা মডেলেরই সুপারিশ করেছে (বিশ্বব্যাংক, ১৯৭৪)।

১৯৭৫ এর শুরুতে "দ্বিতীয় বিপ্লব" ও "শোষণমুক্ত সমাজ" এর জন্য যখন একদলীয় শাসন জারী হয় তখনও বিশ্বব্যাংককে বেশ প্রসন্নই মনে হয়েছে। তাদের দলিলে তখন বলা হয়েছেঃ "সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তন আইন শৃঙ্খলার অবনতি রোধ, চোরাচালানী, মজুতদারী, বস্তি উচ্ছেদে সরকারের হাতকে শক্তিশালী করেছে। সাহায্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকার ও দাতাসংস্থাসমূহের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ বেশ ভাল কাজে দিচ্ছে।" তাদের উদ্বেগ ছিল সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বেতন বেঁধে দেয়ায়। চাপ ছিল, অর্থনৈতিক 'সংস্কার' ত্বরান্বিত করবার (বিশ্বব্যাংক,১৯৭৫)। উল্লেখ্য মে মাসেই বিশ্বব্যাংক প্রস্তাবিত সংস্কার কর্মসূচী শুরু হয়।

১৯৭৫-এ রক্তক্ষয়ী রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর নতুন সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পরেও বিশ্বব্যাংকের প্রশংসাসূচক বক্তব্য পাওয়া গেছে (বিশ্বব্যাংক, ১৯৭৬)। এর পরের দুইদশক বিশ্বব্যাংকের অব্যাহত বিজয়গাঁথা রচিত হয়। এদেশের অর্থনীতির সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তেই বিশ্বব্যাংকের ভূমিকা এরপর থেকে ছিল নির্ধারক। বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ইকনমিক মেমোরেন্ডাম বস্তুতঃ

অর্থনীতির দিকনির্দেশক হয়ে দাঁড়ায় (ভট্টাচার্য্য, ১৯৯৪; সায়েদুজ্জামান,১৯৯৫)। ১৯৮৬-৮৭ থেকে পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক পেপার আরও শক্তিশালী দিকনির্দেশকে পরিণত হয়। এ সম্পর্কে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী সায়েদুজ্জামানের বক্তব্য খুব প্রাসঙ্গিকঃ "ব্যাংক ও আইএমএফ সব সময়ই বলতে চায় যে, এই পেপার সরকারের, কিন্তু এটি তারা সব সময় নিজেরাই তৈরী করতে চায়" (সায়েদুজ্জামান,১৯৯১ঃ২৭১-৮১)। বিশ্বব্যাংকের তৎপরতা যে মূখ্যতঃ আমদানী বৃদ্ধির জন্যই নিবেদিত তা তাদের ঋণ কর্মসূচী থেকে স্পষ্টঃ "১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৯২-৯৩ সময়কালে তাদের ঋণ কর্মসূচীর সব চাইতে বড় অংশ আমদানী সহায়তার জন্যই দেয়া হয়েছে" (ভট্টাচার্য্য,১৯৯৪)।

বাংলাদেশ এযাবতকালে যেসব গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সেগুলো কোথায় এবং কিভাবে গৃহীত হয়েছে সেটা খুবই লক্ষণীয় বিষয়। কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি এবং তার সংগে সম্পর্কিতভাবে বিরাষ্ট্রীয়করণ, আমদানি ও রপ্তানি নীতি, গ্যাস চুক্তি স্বাক্ষর, অর্থকরী প্রতিষ্ঠানে সংস্কার, কর কাঠামোর বিন্যাস ইত্যাদি সকল সিদ্ধান্ত এবং দেশের নির্বাচন-গণতন্ত্র-নির্বাচিত সংস্থার সম্পর্ককে বিচার করলে দেখা যাবে এই দুটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং পরেরটির উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি দ্বারা আগেরটিব প্রভাবিত হবে না। আগেরটি পুরোপুরি স্বাধীন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহীতাদের স্বচ্ছ চেহারা নেই। বিশ্বব্যাংক এসব সিদ্ধান্তের কেন্দ্রীয় শক্তি। বাস্তবতঃ দেখা যাবে, বাংলাদেশে অর্থনৈতিক কুশাসনে যারা যত বেশি নির্ধারক ভূমিকা পালন করে তাদের জবাবদিহিতার সুযোগ তত কম। এ ক্ষেত্রে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তারা হল, বৃহৎ রাজনৈতিক দলসমূহ, আমলাতন্ত্র, বৃহৎ ব্যবসায়ী সংস্থা এবং বিশ্বব্যাংক-আইএমএফসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা। আন্দোলন, নির্বাচন, পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইত্যাদির মাধ্যমে বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোর সীমিত জবাবদিহির কিছু ব্যবস্থা সৃষ্টি হলেও অন্যদের কোনরকম জবাবদিহিতার সুযোগ নেই।

এনজিও

বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রমের বয়স প্রায় ২৫ বছর হতে চললো। স্বাধীনতার পর, বিশেষতঃ মধ্য ৭০ দশক থেকেই এনজিও নামক উন্নয়ন সংস্থাগুলোর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। দারিদ্র বিমোচনের প্রসঙ্গে এনজিও-র কথাই আলোচনায় বেশি আসে। বস্তুতঃ গ্রাম ও পরিবার পর্যায়ে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ত্রাণ বিষয় কর্মসূচির জন্য এখন এনজিওর নাম বেশি উচ্চারিত হয়। সরকার ও বাজারের চলতি বিতর্কে এনজিওকে একদিকে যেমন সরকারের ব্যর্থতার ফসল

হিসেবে বর্ণনা করা যায় আবার সেইসঙ্গে এটাকে বাজারের ব্যর্থতার ফসল হিসেবে দেখা যায়। এদুটোর কোনটি এনজিওর পিছনে নির্ধারক তা নিয়ে মতবিরোধ আছে, এর মধ্যে না গিয়ে বলা যায় এদুটোর মধ্যেই সত্যতা আছে। কিন্তু এক্ষত্রে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বাজার ও সরকারকে এভাবে আদৌ আলাদা করে দেখা যায় কিনা। এই কাঠামোতে চিন্তা করলে আমরা তৃতীয় মতটি পাই সেটি হলো প্রান্তস্থ সমাজে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশের সমস্যারই ফসল এনজিও।

বর্তমানে এক হাজারেরও বেশি এনজিও দেশে কাজ করছে। প্রায় ১ লাখ কর্মী এসব সংস্থায় কাজ করছেন এবং এসব সংস্থার ক্ষুদ্র ঋণ নেটওয়ার্কে জড়িত আছেন প্রায় ৪০ লাখ মানুষ, যাদের অধিকাংশ নারী (এনজিও ব্যুরো,১৯৯৫)। এসব এনজিওর মূল বৈশিষ্ট্য হলো এগুলো প্রায় সর্বাংশে বিদেশী তহবিল নির্ভর (মুহাম্মদ, ১৯৮৮,১৯৯৬; সেন ১৯৮৯), সরকারী না হলেও রাষ্ট্রীয় নীতি-পরিকল্পনার অধীনস্থ, এদের প্রায় সকলেই টার্গেট গ্রুপ কেন্দ্রীক কর্মসূচি নিয়ে কাজ করে। একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, "১০টি খুব গুরুত্বপূর্ণ এনজিওর (দেশী ও আন্তর্জাতিক) মোট বাজেটের ৯৩.৯৯%ই আসে বিদেশী বিভিন্ন সংস্থা থেকে। প্রাপ্ত তহবিলের ৭.৮২% খরচ হয় স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পয়ঃনিষ্কাশন খাতে; ১০.৪৬% খরচ হয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য এবং ২১.২৬% খরচ হয় ক্ষুদ্রঋণ বাবদ" (ভট্টাচার্য্য, সালেহ উদ্দীন, ১৯৯৫)। অন্য একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, ১০০ টাকা ঋণ দেবার জন্য খরচ হয় প্রায় ৬০ থেকে ৮০ টাকা (সেন, মুহাম্মদ,পূর্বোক্ত)। এনজিও মডেলে ঋণ প্রদান কর্মসূচির সবচাইতে সার্থক প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টান্ত হল গ্রামীণ ব্যাংক। লাভজনক ব্যাংক হিসেবে এর সাফল্য প্রশ্নাতীত, তবে দারিদ্র বিমোচন, আত্মনির্ভরশীলতা সৃষ্টি এর ভূমিকা নিয়ে যে ধারণা প্রচলিত তার সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশের সঙ্গত কারণ আছে। ওসমানী গ্রামীণ ব্যাংক মডেলকে লেইসেজ-ফেয়ার আপ্রোচ বলেছেন; লুইস এটিকে পুরনো চুঁইয়ে পড়া তত্ত্বেরই সফল বাস্তবায়ন বলেছেন; ওয়েষ্টারগার্ড পুরো এনজিও কর্মসূচিকেই বিশ্বব্যাংক ও 'দাতা' সংস্থাসমূহের বেসরকারী কর্মসূচীর অংশ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। (ওসমানী,১৯৮৯;লুইস,১৯৯৪; ওয়েষ্টারগার্ড,১৯৯৬)।

নারীর আয় উপার্জনে বিরাট ভূমিকা পালনের জন্য এনজিও কর্মসূচীকে যেভাবে একক কৃতিত্ব দেয়া হয় তাতে এদেশের শ্রমজীবী পরিবারগুলোতে এনজিও উদ্ভবের অনেক আগে থেকে নারীর শ্রমচেষ্টা কাজকে অস্বীকার করা হয় এবং এটাও আড়াল করবার চেষ্টা হয় যে, "এনজিওগুলোর মধ্যে নারী-সম্পর্কিত কাজের জন্য গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, প্রশিকা ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন

করেছে। কিন্তু এগুলোর কেউই উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রাপ্তির সম্ভাবনাযুক্ত কাজে নারীকে উন্নীত করবার মতো উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি" (হামিদ, ১৯৯৫ : ১৫১)। ঋণ ব্যবহারের মূল প্রবণতা হল ব্যবসা।

এনজিও কর্মসূচীর কারণে পরিবার পর্যায়ে আয় বৃদ্ধি, শিক্ষা ও সচেতনায়নের বিস্তার সম্পর্কে সাধারণ ধারণা রয়েছে। বিভিন্ন সমীক্ষায় এর সপক্ষে তথ্যও পাওয়া যায়। কিন্তু দারিদ্র পরিস্থিতি সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে, জাতীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যে এর খুব জোরদার প্রভাব টের পাওয়া যায় না। গ্রাম পর্যায়েও বিভিন্ন গবেষণায় এর গুণগত দিকটি সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায় তা এনজিও সম্পর্কে প্রচলিত ও প্রচারিত উচ্ছ্বাসকে ম্লান করে দেয়। বিআইডিএস-এর দারিদ্র বিষয়ক দীর্ঘমেয়াদী গবেষণায় ১৭টি গ্রামের উপর পুনঃসমীক্ষায় দেখা যায়, শতকরা মাত্র ১৯ ভাগ উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, তাদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে, শতকরা ২৪ ভাগ জানিয়েছেন তাদের অবস্থার অবনতি হয়েছে এবং ৫৮ ভাগ তাদের অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে বলে জানিয়েছেন। যাদের উন্নতি হয়েছে সেই শতকরা ১৯ ভাগের এর মধ্যে শতকরা ৫ ভাগ তাদের উন্নতির পেছনে এনজিও-র ভূমিকা আছে বলে জানিয়েছেন (রহমান, ১৯৯৫)।

তিন। সম্পদ, আয়, কর্মসংস্থান এবং লুম্পেনাইজেশন

সামাজিক বিন্যাসে পরিবর্তন

বাংলাদেশে অর্থনীতি ক্ষেত্রে যে ভাঙচুর হয়েছে, অভ্যন্তরীণ গঠন ও বৈশ্বিক যোগাযোগে যে পরিবর্তনগুলো এসেছে তা সমাজে শ্রেণী গঠন ভাঙ্গনকেও নির্ধারণ করেছে। পুরনো শ্রেণীসমূহ ও সেগুলোর আন্তঃসম্পর্ক, আপেক্ষিক শক্তিবিন্যাস একইভাবে নেই। অর্থনীতির ভরকেন্দ্র এখন আর কৃষি নয়; তাই কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত মানুষের সংখ্যা কমছে, কৃষি এখন মুনাফার বিচারে কম আকর্ষণীয়। অর্থনীতির ভরকেন্দ্র হিসেবে দাঁড়িয়েছে ব্যবসা ও সেবাখাত। গ্রাম শহরে, শিল্প ও কৃষির সঙ্গে জড়িত মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির হারের চাইতে অনেক বেশি হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে জানা-অজানা ব্যবসা ও সেবাখাতের সঙ্গে জড়িত মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির হার। তাছাড়া আয়ের ক্ষেত্রেও দেখা যায় গত দুই দশকে অন্যান্য খাতে নীট আয় কমলেও এই খাতগুলোতে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে (সেন, বিশ্বব্যাংক ঃ ১৯৯৬)।

গ্রামাঞ্চলে মোট জনসংখ্যায় ১৯৭২-৭৩ সালে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের শতকরা হার ছিল ৩৩ ভাগ, অর্থাৎ সেসময় কৃষকরাই ছিলেন গ্রামের সংখ্যাগুরু

জনগোষ্ঠী, বর্তমানে ভূমিহীন মজুরদের হার শতকরা ৬০ ভাগ ছাড়িয়ে গেছে অর্থাৎ গ্রামীণ সমাজে সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠী এখন আর কৃষক নন, মজুর। এই মজুরদের সংখ্যাবৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষিতে কর্মসংস্থান তৈরী হয়নি। ফলে অকৃষিখাতে এদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। বেড়েছে শহরে কাজের খোঁজে পাড়ি দেয়া মানুষের সংখ্যা। ঢাকা শহরের সর্বশেষ সমীক্ষা অনুযায়ী, ঢাকার শতকরা ৬১ ভাগেরও বেশি মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করেন, কয়েক লক্ষ মানুষ ফুটপাতে রাত্রি যাপন করেন। এদের অধিকাংশই প্রাক্তন কৃষক, বর্তমানে টুকটাক কাজে নিয়োজিত কিংবা কর্মহীন, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৫-৯৬ এর শ্রমশক্তি জরীপ অনুযায়ী দেশে মোট কর্মহীনের সংখ্যা ১ কোটি ৪০ লক্ষ, যার মধ্যে পুরুষ ৯০ লক্ষ। মোট সক্রিয় শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ৬৫ লক্ষই শিশু।

সম্পদ ও আয়ের মেরুকরণ

দেশে কৃষি ও শিল্পের তথ্যাবলী থেকে আমরা পরিষ্কার দেখি যে, অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও উৎপাদন কিছুমাত্রায় বেড়েছে। খাদ্য উৎপাদন যা বেড়েছে তাতে মাথাপিছু খাদ্যপ্রাপ্তি বেড়েছে। কিন্তু আমরা আবার একই সঙ্গে দেখি অনাহারী মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি। শিল্প উৎপাদন সূচক দেখলে সেখানেও আমরা বৃদ্ধি পাই কিন্তু পাশাপাশি আবার দেখি মজুরদের প্রকৃত আয় হ্রাস। সর্বনিম্ন ৫% ও সর্বোচ্চ ৫% এর আয়ের অংশ বিচার করলে আমরা দেখি সর্বনিম্ন ও নীচের আয় গ্রুপের আয় হ্রাস, উচ্চ আয় গ্রুপের আয়বৃদ্ধি। সর্বোচ্চ আয়ের ৫% এর আয় যে হারে বেড়েছে, সর্বনিম্ন ৫% এর আয় কাছাকাছি হারেই কমেছে। জিডিপিতেও কৃষি শিল্প-স্বনিয়োজিত শ্রমিকদের অংশীদারীত্ব কমেছে।

সারণী -১২। মোট আয়ে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মানুষের আয়ের শতকরা অংশ

পর্যায়	বছর					৮৩-৯৬ এর পরিবর্তনের হার
	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৮-৮৯	১৯৯১-৯২	১৯৯৫-৯৬	
সর্বনিম্ন আয়ের ৫%	১.১৭	১.১৮	১.০৬	১.০৩	০.৮৮	-২৪.৭৯
সর্বোচ্চ আয়ের ৫%	১৮.৩০	২১.৩৫	২০.৫১	১৮.৮৫	২৩.৬২	+২৯.০৭

সূত্রঃ বিবিএস. পূর্বোক্ত।

১৯৭২-৭৩ সালে বাংলাদেশে কোটিপতির সংখ্যা ছিল হাতে গোণা কয়জন। বর্তমানে নির্দিষ্ট সংখ্যা বলা কঠিন তবে আন্দাজ করা যায় তাদের সংখ্যা কয়েক হাজার। দেশে ব্যয়বহুল গাড়ি-বাড়ি জীবনযাপন ইত্যাদিকে নির্দেশক হিসেবে বিবেচনা করলে বোঝা যায় গত প্রায় তিন দশকে দেশে একটি বিপুল বিত্তশালী জনগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন বিশ্লেষণে এটা সুনির্দিষ্টভাবে ধারণা করা যায় যে, এদের সংখ্যা শতকরা ১ ভাগের বেশি হবে না। অন্যদিকে এই গোষ্ঠীর অস্তিত্ব আয়কর চিত্র দেখলে বোঝা যাবেনা। বিত্তবানদের উদ্ভব ও দেশে কালো টাকার অভূতপূর্ব শক্তি বৃদ্ধি-এ থেকে বোঝা সম্ভব।

জীবনযাত্রার ব্যয়, ভাঙচুর ও নতুন আয়ের সন্ধান

সীমিত আয়ের লোকের মধ্যে একদিকে নতুন ব্যয় কাঠামোর প্রভাব পড়েছে অন্যদিকে তাদের প্রকৃত আয় কমেছে। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে শতকরা প্রায় ২০৪৮ ভাগ। নীচের সারণীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সমাজের বিভিন্ন পেশায় প্রকৃত আয় কিভাবে কমেছে। বিশ্বব্যাংক সাধারণভাবে মজুরী ও বেতন বৃদ্ধির বিরোধী, যদিও বৃদ্ধি নয় ৭২-৭৩ এর সমান করতে গেলেই মজুরী-বেতন দুইগুণেরও বেশি বাড়াতে হয়। বিশ্বব্যাংক অবশ্য তার সর্বশেষ দলিলে সচিবদের বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারে নমনীয়তা দেখিয়েছে (বিশ্বব্যংক,১৯৯৬)।

সারণী -১৯ । সরকারী বেতন/মজুরীর বিকাশ ধারা, ১৯৭২-৯৮

পেশা	৭১-৭২ সালে মূলবেতন /মজুরী	৯৮ সালে প্রাপ্ত মূলবেতন/ মজুরী	৭২ সালে সমান ক্রয় ক্ষমতা হলে মূলবেতন/মজুরী কমপক্ষে কত হবে	৭২ সালের তুলনায় প্রকৃত আয়(%)
রাষ্ট্রয়াত্ত শিল্প শ্রমিক	১২৫	৯৫০	২৫৬০.০০	৩৭.১০
বিশ্ববিদ্যালয় প্রভাষক, ডাক্তার, প্রকৌশলী	৪৫০	৪৩০০	৯২১৬.০০	৪৬.৬৫
সচিব	১২০০	১৫০০০	২৪৫৭৬.০০	৬১.০৩%

প্রকৃত আয় কমা সত্ত্বেও ভোগ কাঠামোতে নতুন নতুন দ্রব্যের সংযোজন ও ব্যয়বৃদ্ধির ব্যাখ্যা করতে গেলে আমরা আরও কিছু বিষয় পাই যেগুলো গত আড়াই দশকেরও বেশি সময়কাল ধরে বিকশিত হয়েছে ঃ

(১) পেশাজীবী-শ্রমজীবী উভয় স্তরে এক-পুরুষের আয় নির্ভর পরিবারের ধারণা ভাঙনের সম্মুখীন হয়েছে। পরিবারের নারী সদস্যদের আয় এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন পেশায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এরই বহিঃপ্রকাশ।

(২) নির্ধারিত কাজের বাইরে বাড়তি আয়ের অনুসন্ধান, বৈধ ও অবৈধ, একটি স্বাভাবিক প্রবণতায় পরিণত হয়েছে।

(৩) কাজ ও আয়ের সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য বিদেশে গমন একটি পথ হিসেবে অনেকেরই চেষ্টার ক্ষেত্র। সেটি আবার অন্যদিক থেকে জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

(৪) সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীতে প্রকৃত বেতনের হ্রাস ঘটলেও বাড়তি আয়ের কিছু পথ তৈরী হয়েছে, বিদেশী সাহায্য পুষ্ট প্রকল্প, গবেষণা, বিদেশ সফর ইত্যাদি। এছাড়া এমনকিছু পেশা তৈরী হয়েছে যেগুলোতে উচ্চ পর্যায়ের বেতন সরকারী-আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক বেশি। যেমন, বিদেশী ব্যাংক-আন্তর্জাতিক সংস্থা, এনজিও, বেসরকারী ক্লিনিক, টিউটোরিয়াল, বিশ্ববিদ্যালয়, বৃহৎ ব্যবসায়িক গ্রুপ ইত্যাদি।

(৫) সরকারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে ঘুষ, দুর্নীতি এখন সার্ভিস চার্জ হিসেবে বিবেচিত হয় যা অন্যদিকে সরকারের বাড়তি ব্যয় সৃষ্টি করে সিস্টেম লস হিসেবে। জনগণের করের অর্থ এভাবে স্থানান্তরিত হয় এবং নতুন কনজিউমার গোষ্ঠী তৈরী করে। ভোগ্যপণ্য আমদানীর সঙ্গে যার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে।

(৬) গত আড়াই দশকে দেশে বেসরকারী খাতের সম্প্রসারণ সবচাইতে বেশি দেখা যায় ব্যবসা ও সেবা খাতে। সেকারণে ঢাকা শহরে যে সব ব্যবসায়িক ও সার্ভিস ওরিয়েন্টেড প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাবৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্য সেগুলোর মধ্যে আছেঃ চাইনিজসহ বিভিন্ন আয় গ্রুপের হোটেল রেস্তোরাঁ, ইন্ডেন্টিং প্রতিষ্ঠান, হাত দেখা-জ্যোতিষবিদ্যা, গাড়ির দোকান, বিউটি পার্লার, সুপার মার্কেট, টেলিফোন-ফ্যাক্স এর বাণিজ্য দোকান, ডিশ ব্যবসা, ভিডিও দোকান, কম্পিউটার, ক্লিনিক, কোচিং সেন্টার ইত্যাদি। এসব প্রতিষ্ঠান যে ধরনের পেশার চাহিদা তৈরী করেছে তার অস্তিত্ব আগে ছিল না।

উপসংহার

অভিজ্ঞতা থেকে আমরা পরিষ্কারভাবেই দেখতে পাচ্ছি যে, নির্বাচিত সংস্থা এবং সংবিধানে বর্ণিত "অর্থনৈতিক নীতি ও জনগণের অর্থনৈতিক অধিকার" উপেক্ষা

করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন হচ্ছে। এখানে জবাবদিহিতার কথা নিছকই অবান্তর। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গতি আনা ও পুঁজিবাদী বিকাশ ত্বরান্বিত করবার জন্য যে বহুরকম সংস্কার প্রয়োজন সে সম্পর্কে দ্বিমত থাকবার কোন কারণ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল, কোন সংস্কার আমাদের শাসক শ্রেণী নিজেরা সুচিন্তিতভাবে, নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতার চর্চা দিয়ে, সুসমন্বিতভাবে উদ্যোগ নিয়ে করেছে? একটি দৃষ্টান্ত কি আছে? যেসব কর্মসূচী সংস্কারের নামে সবাই গ্রহণ করছেন তার গ্রহণ-বর্জন মাত্রা ঠিক করবার কোন উদ্যোগ কি আছে? এর সাফল্যের অংশীদার অনেক, কিন্তু ব্যর্থতার ও ক্ষয়ক্ষতির শিকার জনগণ হলেও দায়ভার নেবার কেউ নেই।

মুক্তবাজার অর্থনীতি সম্পর্কে সবগুলো বড় রাজনৈতিক দলের মধ্যে এখন অভূতপূর্ব ঐকমত্য দেখা যাচ্ছে। কিন্তু শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি সংস্কার, প্রশাসনিক সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার ইত্যাদি সম্পর্কে এসব দলের নীরবতা, চিন্তাহীনতাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এগুলো প্রয়োজন হলে কিভাবে করা প্রয়োজন এবং প্রয়োজন না হলে কেন নয় সে ব্যাপারে ন্যূনতম কোন আলোচনা-চিন্তাভাবনার খবরও পাওয়া যায়না। ১৯৯১ সালের টাস্কফোর্স রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, বাংলাদেশে এখন রাষ্ট্রীয় নীতিই এমন যে, ব্যবসায়ীরা উদ্যোক্তাদের চাইতে ভাল অবস্থায় আছে এবং চোরাচালানীরা ব্যবসায়ীদের চাইতে ভাল অবস্থায় আছে। বর্তমানে এই অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়েছে এরকম কেউ দাবী করবে বলে মনে হয়না। অর্থাৎ একদিকে উৎপাদনশীল বিনিয়োগকারীদের পুরস্কৃত করা ও অন্যদিকে লুটপাটকারী বা উৎপাদনশীল খাতের ক্ষয়ক্ষতির জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান-এরকম কোন অবস্থা সৃষ্টি হয়নি বরং বিপরীত চিত্রটিই এখনও আধিপত্য বিস্তার করে আছে। আবারও বলা দরকার যে, বাজার "স্বয়ংক্রিয়ভাবে" যাদের প্রতি পক্ষপাত দেখাচ্ছে তারা উদ্যোক্তা নয়।

বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনীতির অগ্রগতির পরিমাণগত ধীরগতি ও গতিমুখের গুণগত দুর্বলতা-ঝুঁকির কেন্দ্রীয় বিষয় হলোঃ উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগে শ্লথতা। এর সঙ্গে সম্পর্কিত বাংলাদেশের শাসক শ্রেণীর ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান, পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কের ধরন ইত্যাদি। বাংলাদেশে অর্থনীতির অভ্যন্তরে গতিশীলতা ও আন্তর্জাতিক পুঁজির প্রভাব প্রতিক্রিয়ায় এদেশে প্রাক পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও সম্পর্কের মধ্যে অনেক ভাঙচুর হয়েছে। পুঁজিবাদী সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠান আগের তুলনায় অনেক বিকশিত হয়েছে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব হল এসবের মধ্যে দিয়ে প্রথমতঃ বাংলাদেশের প্রান্তস্থঃ

অবস্থান ঘোচেনি, দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশের অর্থনীতি আন্তর্জাতিক পুঁজির গতিপ্রকৃতির পেছনে অন্ধভাবে হাঁটছে, তৃতীয়তঃ বাংলাদেশের শাসক শ্রেণী, বৃহৎ বিনিয়োগকারী সম্প্রদায়, বিশেষজ্ঞ মহল নিজেদের নিজস্ব উৎপাদনশীল ভিত্তি গড়ে তোলার স্বাক্ষর এখনও রাখতে পারেনি এবং ফলে চতুর্থতঃ এদেশে শিল্প-কৃষি বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে শক্তভিত্তি গতিশীলতা দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়নি। এর পেছনে তিনটি কারণ এখানে চিহ্নিত করা যায়ঃ

(১) বাংলাদেশেরর শাসক শ্রেণী অর্থাৎ বিদ্যমান সমাজের নেতৃত্বদানকারী শ্রেণীর মধ্যে ঝুঁকিপ্রিয় সৃজনশীল উদ্যোক্তা শ্রেণীর আপেক্ষিক দুর্বল অবস্থান। এই দুর্বল অবস্থান প্রতিফলিত হয় একই সঙ্গে সরকার, সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থা ও ব্যবসায়িক গ্রুপগুলোর মধ্যে। যে কারণে উৎপাদনমুখী বিকাশের কোন দৃঢ় সমন্বিত পদক্ষেপ কোন দিক থেকেই দেখা যায়না।

(২) অর্থনীতির উদ্বৃত্ত উৎপাদনশীল খাতে পুনর্বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশের অভাব উপরের কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। একই কারণে বুদ্ধিবৃত্তিক ও বস্তুগত সম্পদের কার্যকর কোন ব্যবহার সম্ভব হয়না এবং এর অধিকাংশ অপচয় বা লুটপাট বা পাচারের শিকার হয়। এবং এ থেকেই সৃষ্টি হয় বিদেশী 'সাহায্য' নির্ভরশীলতা, যার উপর গড়ে উঠে এক সুবিধাভোগী গোষ্ঠী, যারা নিজেরা অর্থনৈতিক ক্ষমতার বলয় সৃষ্টি করে, যে বলয় রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রকেও প্রভাবিত করে। এবং

(৩) বিদেশী 'সাহায্য' নির্ভর অপচয়-দুর্নীতি সৃষ্টিকারী, সম্পদ বিধ্বংসী, পরিবেশ বিনষ্টকারী উন্নয়ন প্রক্রিয়ার আধিপত্যের মধ্যে দিয়ে সমাজে উপর থেকে নীচু পর্যন্ত নির্ভরশীলতা ও ভিক্ষাবৃত্তির একটি সংস্কৃতি প্রবল পরাক্রমে বিকাশ লাভ করেছে। এর ফলে সরকার, এনজিও এবং সরকার বহির্ভূত সমজাতীয় রাজনৈতিক দল, বিশেষজ্ঞ, বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিকর্মী, পেশাজীবী সর্বত্র নির্ভরশীলতা ও কপটতা মহামারীর আকার নিয়েছে। এই মহামারীর মধ্যে কোন আত্মবিশ্বাসী জাতীয় উদ্যোগ গড়ে ওঠা অসম্ভব।

এই অবস্থার পরিবর্তন করতে গেলে বিদ্যমান ব্যবস্থা থেকে লাভবান দেশী-বিদেশী শ্রেণীগোষ্ঠীসমূহের রাজনৈতিক শক্তিকে অবশ্যই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। সেজন্য 'নির্দোষ', অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুপারিশ এ অবস্থা পরিবর্তনের বিষয়কে পুরোপুরি ধারণ করতে পারে না।

তথ্য নির্দেশিকা

Abdulla, Abu (ed.) (1991). "The Unrecorded Economy of Bangladesh: Some Preliminary Estimates". Paper presented at the BEA Comference.

Abdullah, abu, and Azizur Rahman Khan. (ed.)(1996). *Sate Market and Development.* Essays in honour of Rehman Sobhan.

Anderson, Kathryn H., Najmul Hossain, and Gian s Sahota (1991). "The effect of labour laws and labour pracitces on employment and Industrialization in Bangladesh" *Bangladesh Development Studies*, Special issue.

Bakht, Zaid (1996) Cross Border illegal trade in Bangladesh: Composition, trends and policy issues, Dhaka: BIDS.

Bangladesh Bank (1990). *Foreign Liabilities and Assets and Foreign Investment in private sector in Bangladesh*. Dhaka.

BBS (1994). *Bangladesh Population Census*, 1991.

BBS (1994). *Statistical Yearbook of Bangladesh*, 1993.

BBS (1995). *Report on Labour force Survey*, 1991-92

BBS (1995). *Report on the Household Expenditure Survey*, 1991-92

BBS (1998). *Report on the Household Expenditure Survey*, 1995-96.

Bhattacharya, Debapria (1994). "A Tale to two Sisters: Two Decades of the Bank and the Fund in Bangladesh." August, Dhaka.

Bhattacharya, Debapriya (1995). "Bangladesh's experience with the strucutural adjustment and enhanced structural adjustment facilities" in Roy H Grieve & Mozammel Haq(ed) *Bangladesh Strategies for Development*. Dhaka.

Bhattacharya, Debapriya (1996). "Micro Evidence on Rural Non-Farm Growth and Policy Impications", BIDS- World Bank Workshop, Dhaka.

Bhattacharya, Debapriya and Salehuddin (1995). GO-NGO Collaboration in Human development initiatives in Bangladesh". mimeo, BIDS.

CPD (1994). *CPD Dialogue Report*, No.1.

CPD (1996). Experiences with Economic Reform-A Review of Bangladesh's Development, Dhaka.

Dilip Kumar Roy (1993). "Privatisation, Trade and Liberalisation in Bangladesh Service Economy." Bangladesh Journal of Political Economy.

GOB(1972). *Budget Speech of Tajuddin Ahmed*. Dhaka: M/O Finance.

GOB(1974). *Budget Speech of Tajuddin Ahmed*. Dhaka: M/O Finance.

GOB(1981,1986,1991). *Bangladesh Economic survey*. Dhaka: M/O Finance.

GOB(1995, 1996, 1998). *Bangladesh Economic Review*. Dhaka: M/O Finance

Hosain, Mahbub (1995). "Agricultural Policy Reforms in Bangladesh: An Overview" Paper presented at a workshop organized by the University of Oxford and the Center for Studies Sciences, Calcutta, India.

Islam, Nurul (1979). *Development Planning in the third world*. Dhaka.

Kamal Siddiqui, Sayeda Rowshan Qadir, Sitara Alamgir, Sayeedul Huq (1990). *Social Formation in Dhaka City*, Dhaka.

Khan, A.R. &j Mahbub Hossain (1989*). The Strategy of Development in Bangladesh*. London.

Khan, Akbar Ali (1995). "Saving in Bangladesh: Trends, Determinants and Policy Options*". Journal of Asiatic Society of Bangladesh*, Hum. vol 40, no.2.

Lewis, David J. (1994). "Catalyst for change. NGOs, Agricultural Technology and the State in Bangladesh". *The Journal of Social Studies*. No. 65.

M. Syeduzzaman (1991). "Bangladesh's Experience with Adjustment policies" in Rehman Sobhan(ed)*Structural Adjustment policies in the Third world*, Dhaka.

M. Syeduzzaman (1995). "Current Macro-Economic and Sectoral Trends in Bangladesh Economy-Some Comments on the Three Recent Reports" Paper presented at the seminar organized by BEA, Dhaka.

Muhammad , Anu (1995). "The Economics of the World Bank, Growing resources Increasing depreivation". *Holiday*.

Muhammad, Anu (1996a). "Actors, Victims and the Rhetoric: A Deconstruction of "Development" Exercise in Bangladesh". Paper presented in the Seminar organised by the Social Science Fculty, Jahangirnagar University.

Muhammad, Anu (1996b). "Intergration, Polarization and Retreat: Some Observations on the SAP, PAP and the NGO exercise in Bangladesh". Paper Persented in the Seminar organised by the Morgan State University and Jahangirnagar University.

Mujeri, Mustafa K., and Sajjad Zohir (1995): "Macro-Economic Developments of the Bangladesh Economy: A Review of Three Reports, Paper presented at a seminar organized, BEA.

Mujeri, Mustafa K., Ouazi Shahabuddin and Salehuddin Ahmed (1993). "Macro economic Performance, Structural Adjustments and Equity: A Frame-work for analysis of Macro-Micro Transmission Mechanism in Bangladesh". In *CIRDAP Monitoring Adjustment and Poverty Bangladesh: Report on the framework Project.*

N. Alam and F. Cookson, "Cross border trade with india" (mimeo), Bangladesh Bank, July 1995.

Non-market Work and National Income. The Case of Bangladesh", *The Bangladesh Development Studies*, Vol XXII.

Planning Commission (1973). *First Five Year Plan.*

Planning Commission (1985). *Third Five Year Plan.*

Planning Commission (1990). *Fourth Five Year Plan.*

Planning Commission (1997). *Fifth Five year Plan.*

Planning Commission(1980). *Second Five Year Plan.*

Rahman, Mashiur (1994): *Structural Adjustment, Employment and Workers*. Dhaka.

Ravallion, Martin, and Binayak Sen (1994). When Method matters. Towards a Resolution of the Debate over Bangladesh's Poverty Measures. Policy Research Working Paper. World Bank, Washington.

Rehman Sobhan (1982). *The Crisis of External Dependence*, Dhaka.

Rehman Sobhan (1992). *From Aid Dependence to Self Reliance*, Dhaka:UPL.

Rehman Sobhan (ed.) (1990). Structural Adjustment Policies in the third World, a BIDS-WIDER Seminar Report, Dhaka.

S.R. Osmany (1989). "Limis to the Alleviation of Poverty through Non-farm Credit", *The Bangladesh Development Studies*, vol, XVII.

Saderel Reza (1995a). *Transnational Corporations in Bangladesh*, Dhaka: UPL.

Sadrel Raza (1995b). "The Underground Economy: A Preliminary Sketch", mimeo, BIDS.

Salim Rashid (ed.) (1996) "An assessment of industrial policy in Bangladesh: What policies are we talking about?"

Sattar Zaidi (1995). "The State of the Bangladesh Economy", Paper presented at a Seminar organized by BEA.

Sen, Binayak (1989). 'NGO in Bangladesh Agriculture. An Exploratory Study", in *Bangladesh Agriculture Sector Review*. UNDP

Sen, Binayak (1995). "Rural Poverty Trends, 1963-64 to 1989" in Hossain Zillur Rahman and Mahabub Hossain (ed) *Rethinking Rural Poverty*. Dhaka.

Sen, Binayak (1996). "Rural Non-Farm Sector in Bangladesh. Stagnating and Residual or Dynamic and Potential? BIDS-World Bank Workshop, Dhaka.

Shamim Hamid(1995). "Gender Dimension of Poverty" in Hossain Zillur Rahman and Mahabub Hossain (ed.): *Rethinking Rural Poverty*, Dhaka.

Sultan Hafiz Rahman (1992). "Structural Adjustment and Macroeconomic Performance in Bangladesh in the 1980s" the Bangladesh Development Studies Task Forces (TF) 1991): Report of *the task forces on Bangladesh Development Strategies for the 1990's*. vol: 1-4, Dhaka.

Westergard Kirstan (1996). "Peoples Emporwement in Bangladesh, NGO Strategies, The Journal of Social Studies. No 72.

World Bank & USAID (1996). *The Strucutre and performance of Bangladesh* Manufacturing 1992", Dhaka.

World Bank (1995). *World Tables 1995.*

World Bank (1996). *Bangladesh. An agenda for Action, Dhaka.*

World Bank (1996). *Bangladesh. Government that works*, Reforming the Public Sector, Dhaka.

World Bank (January, 1990). Bangladesh. Poverty and Public Expenditures: An evaluation on the impact of selected government programs.

World Bank (March, 1992). Bangladesh Selected Issues in External Competiveness and Economic Eficiency.

World Bank (March, 1994). Bangladesh: From Stabilization to Growth.

World Bank (March, 1995) *Bangladesh: Recent Economic Developments and Priority* Reform Agenda Rapid Growth.

World Bank (September, 1994). Bangladesh. Development in a Rural Economy.

World Bank(March 1982). Bangladesh: Recent Economic Development and selected Development Issues.

Yilmaz Kamil and Sona Varma (1994). "Trade Policy Reforms in Bangladesh" Industrial Sector Study Working Paper, South Asia Country Department World Bank.

মুহাম্মদ, আনু (১৯৮৮)। *বাংলাদেশের উন্নয়ন সংকট এবং এনজিও মডেল*, ঢাকাঃ প্রচিন্তা প্রকাশনী।

মুহাম্মদ, আনু (১৯৯২)। *বাংলাদেশের কোটিপতি, মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক*, ঢাকাঃ চলন্তিকা প্রকাশনী।

মুহাম্মদ, আনু (১৯৯৩)। *পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ এবং অনুন্নত বিশ্ব*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ সমাজ নিরীক্ষা কেন্দ্র।

মুহাম্মদ, আনু (১৯৯৫) । *বাংলাদেশের উন্নয়ন কি অসম্ভব ?* ঢাকাঃ গণ প্রকাশনী।

মুহাম্মদ, আনু (১৯৯৬)। *নারী, পুরষ ও সমাজ*, ঢাকাঃ সন্দেশ প্রকাশনী।